অন্তরতম

অঁাদ্রে জিদ্

অনুবাদ

অশোক গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স • কলকাতা • ১২

শিল্পী : শ্রীমণীন্দ্র মিত্র

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা

প্রকাশক : শ্রীশিশির সেন
আনন্দ পাবলিশার্স
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর : শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

মানব-জীবনে প্রেম এক দুর্লভ সম্পদ। তারই অপূর্ব ভাষ্য করেছেন জিদ্ এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রেমের পথ তো জটিল, গোলকধাঁধা। যে উত্তুঙ্গে আছেন ভগবান, সেখানে আছে নরনারীর প্রেম। কিন্তু সেই পথ তো তরুণ-তরুণীর কাছে আরও জটিল হয়ে উঠলো—এনে দিল বিয়োগান্ত ব্যথা। অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে অন্তরতমকে মিললো।

'সোটি' (১৪ ও ১৫ শতকের বিদ্রূপাত্মক প্রহসন), কত কি! জিদ্ বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠলেন সাহিত্যসমাজে। তাঁর আঁদ্রে ওয়ালতারের ডায়েরী থেকে তিনি চলে গেলেন 'লা ইমমরালিষ্টে'—'লা পর্তে এত্‌ত্রয়তে' (অন্তরতম)—সেখানেও নিজেরই অভিজ্ঞতার মিশেল পড়লো—আবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার চরম বিকাশ হলো। 'কাউন্টার ফিটার্সসার' 'কেভস্ দ্য ভাতিকানে' কিশোরের প্রকাশের কামনার বিশ্লেষণ চললো। তারপর জার্ণাল। সে তো রোজনামচা—স্মৃতির কণিকা। কিন্তু কনিকা হলেও তার মধ্যে রইল সমস্ত জীবনবেদ লুকিয়ে—সাহিত্য, শিল্পকলা কিছুই বাদ পড়লো না। জিদ্ ফরাসী সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি হলেন ফরাসী সাহিত্যের একজন নেতা। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কলম জিরোল না, লিখেই চললো। অবশেষে জিদের মৃত্যু হলো ১৯৫১ সালে।

জিদ্ ফরাসী সাহিত্যে এনেছিলেন এক নতুন সুর। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের দামামা নির্ঘোষের পূর্বেই এ সুরধারা বয়ে গিয়েছিল, প্লাবিত করেছিল। তাঁর নিজের এবং পরবর্তী কালকেও তা প্রভাবিত করেছিল। তাঁর এই সুরধারা, বিকল্পে তাঁর এই রচনাবলীর নাম দেওয়া যায় বিলম্বিত 'কৈশোরের মহাকাব্য'। তিনি নিজেই ছিলেন পুরোদস্তুর কিশোর, আর কৈশোর মহিমায় মহিমান্বিত। কৈশোরের সমস্ত ধর্ম, তার ছক খোঁজা, তার বাঁচার কামনা—সবই তার রচনায় বিকশিত। তিনি এগুলিকে প্রাণবন্ত করে, রূপে, রঙে, রসে সাজিয়ে, কল্পনায় জারিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি বিলম্বিত কৈশোরকে মহান করে তুললেও—কৈশোর মহান হয়ে ওঠেনি—অন্তত ধুরন্ধর সমালোচকদের তো তাই মত। কিন্তু তাঁরাও স্বীকার করেছেন, তাঁর আর কিছু না থাক, স্টাইল আছে, আছে কল্পনার প্রাখর্য আর ঝলমলো সংলাপ। এতে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আমদানী হয়েছে কল্পনার স্তরে রক্তমাংস। তবে তাঁরা একথাও বলেছেন, জিদের কাউন্টারফিটার্সের নায়ক লাফ-

কাদিওর মাথায় চাঁটি মেরে বলতে ইচ্ছে করে, বাপু, তুমি কি অমনি নওল কিশোরই থাকবে, বেড়ে উঠবে না ?' কিন্তু সমালোচকদের এমন বিদ্রূপবাণেও জিদ্ পরাভূত হননি, বিলম্বিত কৈশোরের পাঁচালী গেয়েই চলেছেন।

এবার তাঁর 'অন্তরতম'র কথাই বলি। তিনি এই বইখানি লিখেছিলেন চল্লিশ বছর পূর্বে। তাঁর স্মৃতিকথা 'ইফ ইট ডাই'-এ তারই হদিশ মেলে। তার জীবনীকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন এই কাহিনীতে। বোন য়্যানকে তিনি ভালবাসতেন, তারই অকাল মৃত্যু এর উপজীব্য। তিনি তার স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'আমি য়্যানের মৃত্যু নিয়ে এক গল্প লিখব ঠিক করলাম, সেই গল্পের নাম হবে— **The Essay of Holy dying**। ওর মৃত্যুর সময় তো আমি ছিলাম না। শুধু ছিল অপরিচিত চোখের সার। ওর এই নিঃসঙ্গ মৃত্যু তো আমাকে হানা দিলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে— আমি যেন কল্পনার কানে শুনতাম, ওর সেই প্রেমময়ী আত্মার অন্তিম ক্রন্দন। ও তো কেঁদে এলিয়ে পড়েছিল। তখন আর ওর কেউ ছিল না একমাত্র ভগবান ছাড়া···এই ক্রন্দনই তো 'অন্তরতমের' শেষ পাতাগুলোতে প্রতিধ্বনি তুলেছে।'

তিনি 'অন্তরতম'তে সেই কিশোর-কিশোরীর প্রেমের পালাই গেয়েছেন। হয়তো তাতে বিলম্বিত কৈশোরের ত্রুটি-বিচ্যুতিও আছে। কিন্তু সমালোচক-ধুরন্ধরদের একথা মেনে নিলেও স্বীকার করতে হবে—এই যে মোহময় পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন, যেখানে নরনারীর প্রেমের ছন্দ গিয়ে মিশেছে ধর্মের মন্ত্রে—এর কি কোনো তুলনা আছে! বিলম্বিত কৈশোরের কাব্য যদি হয়, এ এক মহাকাব্য। দেহজ প্রেমকে দেহাতীতে নিয়ে যাবার কথা বিগত যুগগুলিতে বহু কবি বলেছেন, কিন্তু বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতায় একথা যেমন করে বলেছেন জিদ্—এমনি তো আর কেউ বলতে পারেন নি। এইখানেই জিদ্‌ের কৃতিত্ব—তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

অশোক গুহ

এক

কেউ কেউ হয়তো এই নিয়েই একখানা বই তৈরী করে ফেলতেন ; কিন্তু আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি, সে আমার সবটুকু জীবনী-শক্তি শুষে নিয়েছিল, আমার চরিত্রের সব ধর্ম আমি তার জন্যে উজাড় করে দিয়েছিলাম। তাই সে-স্মৃতি খুব সহজ-সরল করেই আমি লিখবো। যদি কোথাও তা রুক্ষ হয়ে ওঠে, তাল কেটে যায়—উদ্ভাবনী শক্তির আশ্রয় আমি নেব না, দেব না জোড়াতালি, সঙ্গতি রাখতেও যাব না। অল্প বলার যেটুকু আনন্দ আমি আশা করছি, তাকে সাজাতে-গোজাতে চেষ্টা করলে তা উপে যাবে।

বারো বছরে পড়বার আগেই বাবাকে হারালাম। লে হাভার-এ বাবা ছিলেন ডাক্তার, কিন্তু সেখানে আর মার থাকা সম্ভব হোল না। তিনি ঠিক করলেন—পারী যাবেন। সেখানে পড়াশুনো এখানকার থেকে ভাল করেই শেষ করতে পারবো—এ-আশাও তাঁর ছিল। লুক্সেমবুর্গের কাছে তিনি ছোট একটা ফ্লাট-বাড়ি নিলেন, মিস্ আসবার্টন এলেন আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে। মিস ফ্লোরা আসবার্টন মার কোনো আত্মীয়া নন, মার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী হয়েই তিনি প্রথম এসেছিলেন, হলেন সখী-সাথী, তারপরে মিতিনী। আমার ছেলেবেলা কেটেছে এই দুটি নারীর সংসর্গে। ভদ্রতা আর বিষণ্ণতায় ওঁরা দুজনেই ছিলেন সমান সমান। সব সময়ে শোকের পোষাকও পরে থাকতেন। একদিন—

সে তো বহুদিন আগের কথা—মনে হয় বাবা মারা যাবার পরেই—মা তাঁর টুপীর কালো ফিতে বদলে মভ্-রঙা ফিতে ব্যবহার করেছিলেন।

আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—'মা-মণি, ও রং তো তোমাকে মানায় না।' পরদিন আবার সেই কালো ফিতেই ফিরে এসেছিল টুপীতে।

আমার স্বাস্থ্য ছিল বড় ঠুন্‌কো। মা আর মিস আসবার্টনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল—আমাকে রোগ-মুক্ত রাখা। ওঁদের এই উদ্বেগে আমি যে কুঁড়ে হয়ে যাইনি, এর কারণ নিশ্চয়ই এই যে—কাজের প্রতি ভালবাসা আমার ভিতরে শিকড় চালিয়ে দিয়েছিল।

গ্রীষ্ম সুরু হতেই তাঁরা নিজেদের ভিতরে আলাপ-আলোচনা করতেন যে, এবার আমার শহর ছাড়ার পালা এল। জুনের মাঝামাঝি আমরা লে হাভার এর কাছে ফোঁগেসমিরে রওনা হয়ে যেতাম। সেখানে বুকোলেঁ৷ মামার বাড়িতে প্রতি বছর গরমকালটা কাটিয়েও আসতাম।

বুকোলেঁদের সাদা, দোতালা বাড়িখানা গত শতকের আগের শতকে তৈরী। গ্রাম-অঞ্চলের বহু বাড়ির মতোই একখানা মাঝারি গোছের বাগানের মাঝখানেই সেখানা দাঁড়িয়েছিল। বাগানখানাতেও বিশেষত্ব ছিল না, নর্মাণ্ডি অঞ্চলের বাড়িগুলির বাগান যেমন হয়ে থাকে এও ছিল তাই। বাগানের সামনে পূব দিক মুখিয়ে ছিল গোটা চারেক বড় বড় জানালা ; আর পেছনে তো ছিল অনেক-গুলো, কিন্তু দু-পাশে একটিও ছিল না। জানালায় ছোট ছোট শার্সি ; কতগুলি বা সদ্য-লাগানো, পুরাণোদের ভিতরে ওদের রঙ্ দেখাত বড় হালকা—মনে হোত ওরা যেন সবুজ ম্লানিমা নিয়ে পুরাণোদের ভিতরে ফুটে আছে। কতগুলি শার্সির কাঁচে আবার খুঁত ছিল। বাবা-মা বলতেন ওগুলিতে 'বুদ্বুদ' উঠেছে ; ওদের ভিতর দিয়ে গাছ-

পালার আকার যেন বিকৃত দেখাত ; ডাক-হরকরা যখন যেত, ওর পিঠে গজিয়ে উঠতো কুঁজ।

চৌকো বাগিচা, চারদিকে তার দেয়াল-ঘেরা। বাড়ির সামনের অংশটুকুতে ছিল বেশ বড় ছায়াঘন এক মাঠ—তার চারপাশে কাঁকড়-বিছানো পথ। এদিকে দেয়াল ছিল নিচু, বাগানের চারপাশের গোলাবাড়ি আর তার আঙিনা চোখ চালিয়ে দিলেই দেখা যেত ওর উপর দিয়ে। গ্রামাঞ্চলের প্রথামত গোলাবাড়ির একদিকে ছিল বীচ-গাছের সারের পাড় টানা।

বাড়ির পেছনে পশ্চিমদিকে বাগান বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুন্দর ফুলে-ঝলমলো পথ চলে গিয়েছিল দখিনের দেয়াল-ঘেঁসে, সেখানে ছিল মাচা—গাছপালালতা লতিয়ে উঠেছিল সেখানে—সমুদ্রের নোনা হাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য সেখানে পর্তুগালের লরেল-লতা আর গাছপালার ঘন আবরণ রচিত হয়েছিল। আর একটি পথ চলে গিয়েছিল উত্তরের দেয়াল-ঘেঁসে—তারপর ডালপালার ভিতরে মিশে গিয়েছিল। আমার মামাতো ভাই-বোনেরা তার নাম দিয়েছিল 'আঁধার পথ', সে পথে গোধূলির পর তারা যেতে সাহসই পেত না। এই দুই পথ খিড়কির বাগানে মিশে গিয়েছিল—সেখানেও ফুলের বাগানেরই জের চলছিল, তবে একটু ঢালু জমিতে এই যা তফাত। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সেখানে যেতে হোত। খিড়কির বাগানের প্রান্তে ছিল ছোট্ট একটি ফটক—সে ফটকের খিল ছিল দেয়ালের ও-পাশে একটি গাছের সঙ্গে এক অদ্ভুত কৌশলে সংলগ্ন। এখানে এসেই ডান আর বাঁয়ে বীচ-ঘেরা পথ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমদিকের সিঁড়িতে দাঁড়ালে এই গাছপালার উপর দিয়ে দেখা যেত পেছনের সমতল প্রান্তর—আর তার চমৎকার শস্যের সজ্জা। দিগন্তে দেখা দিত কোনো এক ছোট্ট গ্রামের গীর্জাটি—বহু দূরে তো সে নয়। নিথর হাওয়ায় গ্রামের গোটা কয়েক বাড়ির ধোঁয়াও দেখা যেত।

গ্রীষ্মের প্রতিটি সন্ধ্যায় নৈশ-ভোজনের পর আমরা এই ঢালু বাগানে এসে জড়ো হতাম। গুপ্ত-দুয়ারটি খুলে আমরা চলে যেতাম বীচঘেরা পথের যেখানে বেঞ্চিটি পাতা, সেখানে। এখান থেকে দেখা যেত সমস্ত অঞ্চলটি ; খড়ের চালার নীচে আগে যেখানে সার তৈরী হোত, সেখানটাতে গিয়ে বসতেন আমার মামা, মা আর মিস আসবার্টন। সামনে ছড়িয়ে থাকত কুয়াশাভরা উপত্যকা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম দূর বনের শিয়রে সোনালি হয়ে এল আকাশ। বাগানের শেষ সীমানায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কেটে যেত তার পরে, সেখানে তখন আঁধার হয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখতাম, মামিমা বসবার ঘরে আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে খুব কমই যেতেন। আমাদের ছোটদের কাছে এইখানেই সন্ধ্যাটি শেষ হয়ে যেত, কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত, আমরা যখন নিজেদের কামরায় বসে পড়ছি, তখন বড়রা যেতেন শুতে।

বাগানে যে-সময়টা না কাটাতাম, তা কাটত ইস্কুল-ঘরে। আমার মামার আপিস ঘরে কয়েকখানা ইস্কুলের টেবিল আমাদের জন্যে আমদানি করা হয়েছিল। আমার মামাতো ভাই রোবার্ত আর আমি পাশাপাশি বসে পড়াশুনো করতাম, পিছনে থাকতো জুলিয়েৎ আর আলিসা। আলিসা আমার চেয়ে দু-বছরের বড়, আর জুলিয়েৎ এক বছরের ছোট। রোবার্ত ছিল আমাদের চারজনেরই ছোট।

আমার ছেলেবেলার স্মৃতি এখানে লিখতে বসিনি, শুধু যতটুকু আমার গল্পে দরকার তাই বলে যাচ্ছি।

বাবার মৃত্যুর বছরেই বলতে গেলে আমার গল্প শুরু হোল। হয়তো শোকে আমার ইন্দ্রিয় তখন অতি-উত্তেজনায় চঞ্চল ; আমার নিজের দুঃখে না হোক, মার দুঃখ দেখেতো বটেই—সে-ই আমার মনকে এই নতুন ভাবাবেগের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

হঠাৎ যেন অকালপক্ক হয়ে উঠলাম, সে বছর যখন ফোঁগেসমিরে

গেলাম, জুলিয়েত আর রোবার্তকে যেন আমার তুলনায় বড় ছোট বলে মনে হোল। কিন্তু আলিসার সঙ্গে দেখা হতেই হঠাৎ মনে হোল—আমরা তুটিতে তো আর ছেলেমানুষ নই।

হাঁ, সেই বছরই বাবা মারা যান, ওখানে পৌঁছে মা আর মিস আসবার্টনের মধ্যে যে আলাপ হয়েছিল, তা-ই আমার এই স্মৃতিকে সমর্থন করছে। মনে আছে, হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখি, মা আর তাঁর বন্ধু আলাপ করছেন, তাঁদের আলাপের বিষয় আমাদের মামিমা। তিনি শোকের রীতি পালন করছেন না, এরই মধ্যে সমাজে বেরুতে শুরু করেছেন জেনে মা রেগে গেছেন (সত্যি বলতে গেলে মাকে যেমন নানা রঙের বেশে কল্পনা করা যায় না, তেমনি বুকোলেঁা মামিমাকে করা যায় না কালো পোষাকে) আমরা যেদিন এলাম, লুসিলি মামিমা যতদূর মনে পড়ে মসলিনের গাউন পরেছিলেন। মিস আসবার্টন চিরদিনই তুপক্ষের মন রেখে চলেন, তিনি মাকে শান্ত করতে গেলেন।

ভয়ে ভয়ে যুক্তি দেখিয়ে বললেন, 'সাদাও তো শোকেরই রং।'

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ যে লাল শালখানা কাঁধে জড়িয়ে আছে, ওখানাও কি শোকের রং নাকি ? ফ্লোরা, তোমার ভাবগতিক দেখে সত্যিই আমার লজ্জা করছে।'

শুধু ছুটির সময়েই মামিমাকে দেখেছি। এ-তো নিশ্চিত যে গ্রীষ্মের গরম বলেই তিনি এমন স্বচ্ছ গলা-কাটা বডিস পরতেন। ঐ পোষাকেই তাঁকে আমার মনে আছে। শাল তিনি জড়াতেন অনাবৃত কাঁধে। কিন্তু ঐ ঝলমলে শালের জন্য তো রাগ নয়, মামিমার ঐ গলা-কাটা বডিস দেখেই মা শিউরে উঠতেন।

লুসিলি বুকোলেঁা ছিলেন খুব সুন্দরী। ওঁর একখানা খুদে ছবি এই তো আমার পাশেই রয়েছে, উনি তখন যেমনটি ছিলেন, ঠিক তেমনটিই তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে এত কম বয়েসী মনে

হোত যে, তিনি নিজের মেয়েদের বড় বোন বলেই অনায়াসে চলে যেতে পারতেন। এই তো তিনি তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই বসে আছেন, মাথা বাঁ হাতের উপর দিয়েছেন এলিয়ে, খুদে আঙুলটি কি এক অপরূপ ভঙ্গীতে ঠোঁটের উপর রয়েছে। তাঁর চুলের গোছা একখানা জাল দিয়ে ঘেরা। জালের রন্ধ্রগুলি বড় বড়। চুলের গোছা গ্রীবার উপরে আধ-ভাঙা। কাঁচুলির অর্দ্ধনগ্নতায় দুলছে ইতালীয় নানা পাথরের মিশেলে গড়া পদক, কালো মখমলের ফিতে দিয়ে সেখানি আলগা করে গলার সঙ্গে বাঁধা। কারু-কাজ করা মখমলের কালো মেখলা তাঁর কটিতট ঘিরে আছে, তার মুখটি একটি বিস্তৃত বো-তে বাঁধা—যেন ফুলের মতোই সেটি ফুটে আছে; সোলার টুপিটি নরম—ধারগুলি তার চওড়া—চেয়ারের পিছনে সেটি ঝুলানো—সব কিছুতেই যেন তাঁর মুখের শিশুর সারল্য বিকশিত। তাঁর ডান হাত ঝুলে পড়েছে—সে হাতে একখানি বোজানো বই।

লুসিলির এক অজ্ঞাত পরিবারে জন্ম, বাপ-মাকে তিনি কখনো চোখে দেখেন নি, নয়তো অল্প বয়সেই তাঁদের হারান। মা পরে বলেছেন, উনি তখন অনাথা, হয়তো বা ওকে ফেলেই চলে গিছলো ওর বাপ-মা—ঠিক এই সময়ে পাদ্রী ভত্তিয়ে আর তাঁর স্ত্রী তাঁর ভার নেন। তাঁদের নিজেদের তখন কোন সন্তান হয়নি। ওরা মার্তিনেক ছেড়ে লে হাভার-এ এলেন কিছুদিন পরে। বুকোলেঁারা এই খানেই বসবাস করতেন। ভত্তিয়ে আর বুকোলেঁা পরিবারে মেলা-মেশা দেখা-শোনা চলতো। আমার মামা তখন বিদেশে এক ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। এই সময়ের তিন বছর পড়ে তিনি বাড়িতে এলেন। খুদে লুসিলিকে একবার দেখলেন; প্রেমে পড়ে গেলেন, আর তখনই বিয়ের প্রস্তাবও করে বসলেন। তাঁর বাপ-মা আর আমার মা বড়ই ব্যথা পেলেন। লুসিলির বয়েস তখন ষোল বছর। এরই মধ্যে মাদাম ভত্তিয়ের দুটি সন্তান হয়েছে, পালিতা ভগিনীর

প্রভাব তাদের উপর কি হবে এই নিয়ে তখন তাঁরা শংকিত—কেননা প্রতি মাসেই তাঁর মতিগতি বদলাচ্ছিল। ভত্তিয়েরা যে কেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন, তা বোঝাতে গিয়ে মা এ গল্প করেছিলেন। আমার নিজের মনে হয়, কুমারী লুসিলি অতি মাত্রায়ই উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। লা হাভার-এর সমাজ আমার ভাল করে চেনা, তাই আমি কল্পনা করে নিতে পারি অমন মনোহারিণী মেয়ে সেখানে কেমন অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। পাদ্রি ভত্তিয়েকে পরে দেখেছি, তিনি শান্ত, নিরীহ মানুষ—ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন না, পাপের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষারও উপায় তাঁর নাই।

তখন তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। মাদাম ভত্তিয়ের কথা কিছুই বলতে পারি না, চতুর্থ সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তিনি মারা যান। সে সন্তানটি আমারই বয়েসী, পরে আমার বন্ধুও হয়েছিল।

আমাদের জীবনের বৃত্তে খুব কম ঘোরাফেরা করতেন লুসিলি। নিজের কামরা থেকে নিচের তলায় তিনি দুপুরের খাওয়া সাঙ্গ হবার আগে কখনো নেমে আসতেন না। এসেই নিজেকে এলিয়ে দিতেন সোফায়, কি দড়ির দোল্‌নায়—আর এমনি করেই সন্ধ্যে অবধি কেটে যেত। যখন উঠতেন, তখনো সেই আগের অলসতাই তাঁর দেহ ঘিরে থাকতো। কল্পিত স্বেদবিন্দু মোছবার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি কপালের উপর রুমালখানা বুলিয়ে নিতেন– তার চামড়া ছিল মসৃণতায় মসৃণতমো। ওঁর রুমাল খানার সৌন্দর্য আর সুগন্ধে আমার মন বিস্ময়ে ভরে যেত। সে সুগন্ধ বুঝি ফুলের নির্যাস নয়, ফলের। কখনো বা কটি-বন্ধনী থেকে বার করতেন খুদে একখানা আরসী—তার উপরে রূপার ঢাকনি—অপসৃয়মান ঢাকনি—ওর ঘড়ীর চেনে নানা টুকিটাকি জিনিষের সঙ্গে ঐ আরসীখানিও ঝুলতো।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতেন, আঙুল ভিজিয়ে নিতেন ঠোঁটে, তারপর চোখের কোলে বুলিয়ে দিতেন সেই ভিজে আঙুল। প্রায়ই হাতে তাঁর বই থাকতো ; কিন্তু সে-বই থাকতো প্রায় সব সময়েই বোজানো। কচ্ছপের খোলার তৈরী পৃষ্ঠা-চিহ্ন থাকতো পাতার ভিতরে গোঁজা। কাছে এলে তিনি স্বপ্নভঙ্গ করে তোমার দিকে তাকিয়ে দেখতেন না। প্রায়ই তার অসাবধানী অলস হাত থেকে, বা পোষাকের ভাঁজ থেকে সোফার পেছনে রুমালখানা মাটিতে খসে পড়তো—নয়তো বা পড়তো বই, ফুল বা ঐ পৃষ্ঠা-চিহ্নটি। একদিন ওঁর বই খানা আমি তুলে দিয়েছিলাম—কিন্তু আপনাদের বলি, এ আমার ছেলেবেলার স্মৃতি—লজ্জায় আরক্ত হয়ে দেখলাম সেখানি কবিতার বই।

সান্ধ্যভোজের পরে যে পারিবারিক সান্ধ্য আসর বসতো টেবিলে, সেখানেও লুসিলি বুকোলেঁা যোগ দিতেন না। তিনি পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসতেন, শ্যঁপাঁর (পোল্যাণ্ডবাসী বিখ্যাত সুরকার) বিলম্বিত লয়ের মাজুরকার দু-একটা গৎ বাজিয়ে তিনি আনন্দ পেতেন। হয়তো তাতে শান্তিও ছিল। কখনো বা একটা সুরের মাঝখানে এসে ছেড়ে দিতেন, থেমে যেতেন। ঘাটের উপর স্তব্ধ হয়ে যেত আঙুল আর সুর।

মামিমার সঙ্গে যখন থাকতাম, কি এক অদ্ভুত অস্বস্তিই ভোগ করতাম ! অস্বস্তির এ অনুভূতি, উদ্বেগেরও ; আবার কেমন যেন মিশে ছিল তারিফের আমেজ। আবার এক ভীতিও। হয়তো আমার মনের কি এক অস্পষ্ট প্রবৃত্তি ও'র বিরুদ্ধে আমাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তার পরে আমি জেনেছিলাম, তিনি ফ্লোরা আসবার্টন আর আমার মাকে ঘৃণা করতেন। ফ্লোরারও ছিল তাঁর সম্পর্কে ভীতি, আর মা তো তাঁকে পছন্দই করতেন না।

লুসিলি বুকোলোঁ,

তোমার উপর আর যেন আমার ঘৃণা না থাকে এই আমার কামনা ! তুমি যে কত ক্ষতি করেছ আজ যেন মুহূর্ত্তের জন্য আমি তা ভুলে যাই······যাহোক, তোমার কথা ক্রুদ্ধ না হয়েই আমি বলতে চেষ্টা করবো।

সেই গ্রীষ্মের এক দিনে, হয়তো বা পরবর্তী গ্রীষ্মের দিনে—দৃশ্য-সংস্থান তো তার বদলায়নি, কখনো বদলাবেনা ; কিন্তু আমার স্মৃতি কখনো বা স্ফীত হয়ে উঠে সব ভাসিয়ে দেয়, তাইতো গোলমাল হয়ে যায়। সেদিন বসবার ঘরে একখানা বই আনতে যাচ্ছি, উনি ছিলেন সেখানে। চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ডাকলেন। কিন্তু উনি তো আমাকে কখনো দেখেও দেখেননি—এই ছিল ওঁর রীতি।

'জেরোম, অমন করে ছুটে পালাচ্ছ কেন ? আমার ভয়ে না কি ?'

বুকে স্পন্দন নিয়ে কাছে এগিয়ে এলাম, চেষ্টা করে হাসি ফুটিয়ে তুললাম মুখে, বাড়িয়ে দিলাম হাত। তিনি তার হাতে হাতখানা নিয়ে আমার গালে সোহাগ করে চাপড়ে দিলেন। বললেন, 'আহা বেচারী, তোমার মা তোমাকে কি করে সাজায় গো ! কি ছিরি পোষাকের !'

আমি তখন পরতাম নাবিকের পোষাক, তার আবার ছিল মস্ত চওড়া কলার। মামী সেই কলার ধরে টানতে শুরু করলেন।

সার্টের বোতাম খুলে দিতে দিতে বললেন, 'নাবিকদের কলার খোলাই থাকে। দেখতো, আগের চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে কিনা।' নিজের খুদে আরসীখানা বার করে আমার মুখখানা তাঁর মুখের কাছে টেনে নিয়ে এলেন, নগ্ন বাহু জড়িয়ে দিলেন আমার গলায়, তারপর আমার সার্টের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে শুধালেন, আমার সুড়সুড়ি লাগছে কি না। হাত চলে গেল দূরে, আরো দূরে। এমন চমকে উঠলাম যে, আমার সার্ট দুফালি হয়ে ছিঁড়ে গেল। আরক্ত মুখে ছুটেও পালালাম। তিনি পেছু ডাকলেন,

'ওরে খুদে গাধা, ওরে !'

খিড়কির বাগানের আর এক প্রান্তে ছুটে এলাম। ছোট পুকুরটায় ভিজিয়ে নিলাম খুদে রুমালখানা, চেপে ধরলাম আমার মুখ, ঘসে ঘসে ধুলাম আমার গাল, গলা – মেয়েলোকটার স্পর্শ যেখানে যেখানে লেগেছে—সব।

মাঝে মাঝেই লুসিলি বুকোলেঁা ফিট পড়তেন। হঠাৎ হোত রোগের এই আক্রমণ, সমস্ত বাড়ি তখন তছনছ হয়ে যেত। মিস অ্যাস্‌বার্টন ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিয়ে যেতেন, তাদের ভুলিয়ে রাখতেন ; কিন্তু সেই ভয়াবহ চীৎকার তো রুদ্ধ করা তখন অসম্ভব, ছেলেমেয়েদের কানে না পৌঁছেও তো পারতো না। শোবার কি বসবার ঘর থেকে আসতো চীৎকার। মামা যেন পাগল হয়ে যেতেন। বারান্দা দিয়ে তোয়ালে, অ-দ্য কলোঁ, নয়তো ইথারের বোতল আনতে ছুটতেন। সন্ধ্যেয় টেবিলে এসে যখন বসতেন, তখন তাঁকে দেখে মনে হোত কত তাঁর উদ্বেগ, আর বুড়িয়েও যেন গেছেন।

আক্রমণ থিতিয়ে এলে, লুসিলি তাঁর ছেলেমেয়েদের ডেকে পাঠাতেন—রোবার্ত আর জুলিয়েতেরই ডাক পড়তো, কিন্তু আলিসাকে কখনো ডাকতেন না। সেই শোকঘন মন্থর দিনগুলি আলিসা কাটাত ঘরে আগল দিয়ে। তার বাবা কখনো কখনো সেখানে যেতেন, আলিসার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর চলতো আলাপ-আলোচনা।

আমার মামীর এই রোগের আক্রমণ দাসদাসীদের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে দিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যেয় রোগের আক্রমণ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। মার ঘরে আমি বন্দী, সেখান থেকে বসবার ঘরে কি হচ্ছে দেখাই যায় না। এমন সময় রাধুঁনী বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁক পেড়ে বললে, 'কর্তা, কর্তা, শীগ্‌গীর আসুন গো ! ঠাকরুণ যে মারা যান।'

আমার মামা ছিলেন আলিসার ঘরে, নীচে নেমে আসছিলেন, তখন মা বেরিয়ে এলেন। মিনিট পনেরো পরে ওদের স্বর শুনতে পেলাম নিচের তলার জানালার ধারে। মার স্বর কানে এল।

কি মনে হয় জান? সমস্তটাই ওর ভান! কয়েকবার ঐ কথাটা আউড়ে গেলেন, প্রতি কথাটার উপর জোর দিলেন—ভান ভান!

ছুটির দিন তখন শেষ হয়ে এসেছে, বাবার মৃত্যুর পর কেটে গেছে দুটি বছর। আর মামীর ওখানে তেমন ঘন ঘন যাই না। আমাদের পারিবারিক জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হবার আগে একটা ছোট ঘটনা ঘটলো—চরম দুর্ঘটনার কিছু আগেই ঘটলো। লুসিলি বুকোলঁার উপর যে অনিশ্চিত, জটিল অনুভূতি আমার মনে দেখা দিয়েছিল—সে তো রূপান্তরিত হোল ঘৃণায়। কিন্তু সে কথা বলবার আগে আমার মামাতো বোনের কথা বলবো।

আলিসা বুকোলেঁা সুশ্রী মেয়ে এটা তখনো টের পাইনি। শুধু সৌন্দর্য নয়, নানা গুণে ওর দিকে মন টেনে ছিল। ও ছিল ওর মারই মতো—কিন্তু চোখের অভিব্যক্তি এত ভিন্ন ছিল যে প্রথমে এ সাদৃশ্য আমি টের পাইনি। মুখের বর্ণনা আমার আসে না, মুখের খুঁটিনাটি এড়িয়ে যায়, চোখের রঙের বর্ণনা ভুলে যাই। শুধু ওর হাসির ব্যঞ্জনা আমার স্মৃতিতে জেগে আছে—এ হাসি যেন তখনি বিষণ্ণতায় মেদুর। ভ্রূর রেখা ছিল তার চোখ থেকে বহু দূরে, চোখের ওপর সে যেন বৃত্ত রচনা করেছিল। এ রকমটি আর দেখিনি। দাঁড়ান, ভেবে দেখি। দান্তের আমলের ফ্লোরেন্সীয় একটি খুদে মূর্তি দেখেছিলাম, আমার ভাবতে ইচ্ছে করে বিয়াত্রিসে যখন শিশু ছিলেন, অমনি অর্দ্ধবৃত্ত ছিল তাঁর ভ্রূ-যুগল! ঐ ভ্রূ

আলিসার চেহারায়, তার সত্তায় এনে দিয়েছিল এক প্রশ্নের অভিব্যক্তি—সে প্রশ্ন যেমন উদ্বেগ-গম্ভীর, অস্থির, তেমনি বিশ্বাসে সুদৃঢ়। হাঁ, এ এক কামময় প্রশ্নের অভিব্যক্তি। সে ছিল মূর্তিমতী প্রশ্ন, মূর্তিমতী আশা। কি করে যেন এই প্রশ্নময় চোখ আমাকে পেয়ে বসলো, আমার জীবন হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু তবুও একথা বলবো, জুলিয়েতকেই বেশি সুন্দরী বলে মনে হবে। আনন্দ আর স্বাস্থ্যে সে দীপ্ত; কিন্তু ওর এই সৌন্দর্য ওর বোনের লাবণ্যের কাছে তো বহিরঙ্গের মতো—প্রথম দৃষ্টিতেই তা নজরে পড়ে যায় সারা পৃথিবীর। আর রোবার্তের বিশেষত্ব বলে কিছু ছিল না। সে আমারই বয়েসী একটি ছেলে। জুলিয়েত আর ওর সঙ্গে খেলা করতাম, আলিসার সঙ্গে করতাম আলাপ। আমাদের খেলায় ও কমই যোগ দিত; আমার যতদূর মনে পড়ে ওকে আমার গম্ভীরই লাগতো, মৃদু হাসতো ও, কি যেন ভাবতো। কি কথা বলতাম আমরা? ছেলেমেয়েরা কি কথা বলতে পারে? আপনাদের, এখুনি বলছি, কিন্তু তার আগে আমার মামার কথা শেষ করে নিই—তাঁর পালা সাঙ্গ করে দিই।

বাবার মৃত্যুর দু বছর পরে মা আর আমি ঈস্টারের ছুটি কাটাতে এলাম লা-হাভার-এ। বুকোলেঁার বাড়িতে এবার উঠলাম না, শহরের বাড়িতে ওদের কামরা কম, তাই মার বড় বোনের বাড়িতে এসে উঠলাম। এটা ছিল বেশ বড় বাড়ি। প্লাতিয়েঁ-মাসীকে আমি একরকম দেখিনি বললেই হয়, বহুদিন হোল তিনি বিধবা হয়েছেন। ওঁর ছেলেপুলেদেরও চিনি না, ওরা আমার চেয়ে ঢের বড়, আর আমার সঙ্গে ওদের অমিলও যথেষ্ট।

প্লাতিয়েঁদের বাড়ি ঠিক শহরে নয়, শহরে যেতে মাঝ পথে 'কোট' নামে এক টিলার উপরে—টিলাটা আবার শহরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বুকোলেঁারা থাকতেন সহরের ব্যবসায়ী মহল্লায়, একটা খাড়া পথে

কয়েক মিনিটে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যাওয়া যেত। আমি তো দিনে কয়েকবারই এই পথে ছুটতে ছুটতে যেতাম আর আসতাম।

সেদিন মামার বাড়িতে দুপুরে খেয়ে নিলাম। খাওয়ার পর মামা বেরিয়ে গেলেন। আমি অফিস অবধি ওঁর সঙ্গী হলাম, তারপর প্লাতিয়েঁদের ওখানে এলাম মাকে নিয়ে যেতে। সেখানে এসে শুনলাম, মাসীর সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেছেন, সান্ধ্যভোজের আগে ফিরবেন না। আবার ফিরে এলাম শহরে। শহরে একা আসতে খুব কমই পাই, তাই আজ গেলাম ঘুরতে ঘুরতে জেটির দিকে। সেদিন সমুদ্রের কুয়াশায় জেটি ছিল আঁধার, জনবিরল। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, হঠাৎ কি এক কামনা পেয়ে বসলো, ফিরে যাব, আলিসাকে অবাক করে দেব। কিন্তু এই মাত্রতো ওর ওখান থেকে এসেছি। তবুও পেয়ে বসলো ইচ্ছা। শহরের ভিতর দিয়ে ছুটে চলে এলাম, বুকোলেঁদের বাড়ীর দরজায় এসে বাজালাম ঘন্টি, তীরের মতো ছুটে চলেছি সিঁড়ি বেয়ে উপরে, যে দাসীটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে থামিয়ে দিয়ে বললে,

জেরোমি, উপরে যেও না! কর্ত্রী আবার ফিট পড়েছেন। ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। মামীকে তো দেখতে আমি আসিনি···আলিসার ঘর চারতলায়, দোতলায় বসবার আর খাবার ঘর, তেতলায় মামার ঘর। সেখান থেকে আসছে স্বরের গুঞ্জন। দরজা খোলা, তারই পাশ দিয়ে যেতে হবে। এক ঝলক আলো ভিতর থেকে ঠিকরে এসে পড়েছে সিঁড়িতে। কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে একটু বা দ্বিধা হোল, আঁধারে সরে গেলাম। কি দেখলাম! অব্যক্ত বিস্ময় ঘনিয়ে এল। মামী সোফায় এলিয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে, পর্দা ফেলা চারদিকে, দুটো ঝাড়ে জ্বলছে মোমের বাতি। আনন্দ-চঞ্চল আলোয় আলো হয়ে আছে। রোবার্ত আর জুলিয়েৎ তাঁর পায়ের কাছে, তাঁর পিছনে লেফটেনাণ্টের উর্দি-পরা একটি

যুবক। দুটি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে খারাপ লাগছে আজ, কিন্তু সেদিন লাগেনি। ওরা হাসছিল আর তাকাচ্ছিল অপরিচিতের দিকে। আর সে বলছিল নাকি সুরে।

বুকোলোঁ, বুকোলোঁ!…আহা আমার যদি একটা পোষা ভেড়া থাকতো তাকে বুকোলোঁ বলে ডাকতাম।

মামী হেসে উঠলেন। দেখলাম, যুবকটির দিকে বাড়িয়ে দিলেন সিগারেট শুদ্ধ হাত, তাকে ধরিয়ে দিতে ইঙ্গিত করলেন। কয়েকটান টেনে মেঝেয় ফেলে দিলেন সেটা, যুবকটি ছুটে গেল সেটা তুলতে, তারপর স্কার্ফ কি কিছুতে বেঁধে ভান করে পড়ে গেল একেবারে আমার মামীর পায়ের তলায়। এই হাস্যকর অভিনয় চলছিল বলেই অলক্ষ্যে যেতে পারলাম।

আলিসার দরজায় বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক মুহূর্ত কেটে গেল রুদ্ধ প্রতীক্ষায়। হাসির দমক আর স্বর ভেসে এল নীচতলা থেকে, হয়তো আমার করাঘাত ডুবিয়ে দিলে। কোনো সাড়া পেলাম না, দরজা ঠেলে দিলাম, নিঃশব্দে খুলে গেল। ঘর এত আঁধার যে, আলিসাকে দেখতে পেলাম না। ও বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। ওর পেছনের জানালা দিয়ে আসছিল নিঃশেষিত আলোর শেষ ঝলক। আমি কাছে আসতেই ও ফিরে তাকালো। তবু উঠলো না, শুধু বিড় বিড় করে বললে,

জেরোম, কেন ফিরে এলে?

চুমু খাবার জন্য নুয়ে পড়লাম, দেখি অশ্রুস্নাত ওর মুখ… সেই সঙ্গে আমার সারাজীবনের উদ্দেশ্য যেন স্থির করে ফেললাম। আজকেও সে স্মৃতি মনে পড়ে ব্যথা পাই। সেদিন ওর এই ব্যথার কারণ বুঝি আবছা ভাবেই বুঝেছিলাম। অনুভব করেছিলাম, এ ব্যথা ওর ঐ শিহরিত আত্মার পক্ষে দুঃসহ, ঐ ওর ক্ষীণ তনুর পক্ষেও বুঝি! সেতো অন্তঃনিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে বেপথু।

আঁদ্রে জিদ

দাঁড়িয়ে রইলাম ওর পাশে, ও তেমনি হাঁটু গেড়েই বসে। আমার বুকে যে অজানা এক আনন্দ ঘন হয়ে উঠলো, তার তো প্রকাশ করা হোল না, তবু ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরলাম, ওর কপালে বুলিয়ে দিলাম ঠোঁট ছুটির পরশ, আমার সমস্ত আত্মা যেন ওদেরই ভিতর দিয়ে স্রোত হয়ে উৎসারিত হয়ে পড়লো। ভালবাসায় মাতাল আমি, করুণায় আর্দ্র, কি এক আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় আমি অধীর—ভগবানকে সমস্ত শক্তি উজাড় করে ডাকলাম—নিজেকে আহূতি দিলাম তাঁর কাছে। তখন তো ভাবতেও পারলাম না যে, ওকে ভয় থেকে, বিপদ থেকে, এই দুঃসহ জীবন থেকে রক্ষা করা ছাড়া আমার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। আমিও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, আমার সমস্ত সত্তা তখন প্রার্থনায় আকুল। ওকে কাছে টেনে নিলাম, শুনলাম ও অস্ফুট স্বরে বলছে :

জেরোম, ওরা তোমাকে দেখতে পায়নি তো ? তাড়াতাড়ি চলে যাও। ওরা যেন দেখতে না পায়।

তারপরে আরো অস্ফুটে বললে, জেরোম, কাউকে একথা বোল না। বেচারী বাবা তো এসব জানেন না…

মাকে কিছু বললাম না, কিন্তু প্লতিয়েঁ-মাসী আর তাঁর ভিতরে চললো অবিরাম কানাকানি। রহস্যময় হয়ে উঠলো ওঁদের মুখ, ব্যথাতুর, ভাবনা-গম্ভীর দৃষ্টি। আমি যখনি কাছে যেতাম, ওঁরা আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই বলতেন, —'বাছা, এখান থেকে যাও,' এই সব দেখেই বুঝলাম, বুকোলোঁ পরিবারের গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে ওঁরা একেবারে সন্দেহমুক্ত নন।

পারীতে আমরা চলে আসবার পরই মার লা-হাভারে ফিরে যাবার জন্য তার এল। আমার মামীমা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন।

আঁদ্রে জিদ্

কারো সঙ্গে গেছেন? মিস্ আসবার্টনের কাছে মা আমাকে রেখে গিছলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম।

পরিবারের বন্ধু হিসেবে তিনি তখন ভীত, তিনি বললেন, তোমার মাকে জিজ্ঞেস কোরো বাছা।

ছুদিন পরে তিনি আর আমি মার কাছে গেলাম। দিনটা ছিল শনিবার। পরদিন মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে গীর্জায় দেখা হবে এই কথাই ভাবছিলাম; আমাদের দেখা হবার কথাই ভাবছিলাম। মামীর জন্য আমার ভাবনা ছিল না, মাকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করবো না তাও ভেবে রেখেছিলাম।

ছোট্ট গীর্জেয় সেদিন সকালে ভিড় বেশি ছিল না। পাদ্রী ভত্তিয়ে ইচ্ছে করেই হয়তো খৃষ্টের সেই বাণী পড়বেন বলে ঠিক করেছিলেন—সেই যে—সংকীর্ণ তোরণ দিয়ে প্রবেশ করতে চেষ্টা কর!

আলিসা আমার কয়েকখানা আসন আগে বসে ছিল। ওর মুখের ডৌলটি আমার চোখে পড়ছিল। ওর দিকে এমন আত্ম-বিস্মৃত হয়ে তাকিয়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল যেন ওর ভিতর দিয়ে বাণী আসছে আমার কাছে—তাই বুঝি পরম উদগ্রতা নিয়ে শুনছিলাম। মামা মার পাশে বসে কাঁদছিলেন নিঃশব্দে।

পাদ্রী পড়ে গেলেনঃ সংকীর্ণ তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর তোমরা! যে তোরণ বিশাল, যে পথ প্রশস্ত—সে তো মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, আর মানুষ তো ছুটে ছুটে যায় সেই পথে। কারণ সংকীর্ণ তোরণ আর সংকীর্ণ পথ তো জীবনের পথ—সে-পথ তো খুব কম লোকই খুঁজে পায়।

তারপর তিনি প্রশস্ত পথের কথা বোঝাতে লাগলেন···যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেখলাম আমার মামীমার ঘর; সোফায় এলিয়ে

দিয়েছেন দেহ, হাসছেন আর সেই ছিমছাম অফিসারটিও হাসছে··· হাসি আর আনন্দ যেন সেখানে এক অপরাধ—এক মহাবিচ্যুতি···এ হেন ঘৃণ্য পাপেরই চরম অভিব্যক্তি। বহু মানুষ তো যায় সেইপথে, পাদ্রী বলতে লাগলেন। তারপর তিনি বর্ণনা দিলেন একদল সুবেশ, হাস্যোচ্ছল নরনারীর। ওরা দলে দলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে এগিয়ে চলেছে। আমার তো মনে হোল, ওদের দলে আমি ভিড়বো না, ভিড়তে পারবো না। প্রতিটি পদক্ষেপে আমি যে আলিসার কাছ থেকে দূরে, আরো দূরে চলে যাব। আবার পাদ্রী পড়তে লাগলেন। সেই সংকীর্ণ তোরণদ্বার দেখতে পেলাম, ঐ পথেই আমাদের যেতে হবে। স্বপ্নে তলিয়ে গিয়ে মনে হোল, ওতো এক মাড়াই-কলের মতো। ভিতরে চেষ্টা করেই ঢুকতে হবে—ভগবানের দয়া পাবার সেই তো প্রথম পরীক্ষা। সেই তোরণদ্বার যেন আলিসার ঘরের দরজায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। ওরই ভিতরে ঢোকার জন্য আমি নিজেকে নিংড়ে নিলাম—স্বার্থপরতা খসে পড়লো···কারণ, সংকীর্ণ তোরণদ্বার তো জীবনের পথে নিয়ে যায়। পাদ্রী ভত্তিয়ে পড়ে চললেন। ভাবলাম, হয়তো নিয়ে যায় সব দুঃখের পরপারে, উপবাস-উপাসনার পরপারে —আর এক পবিত্র, আলোক-আনন্দের সাড়া পেলাম মনে—এরই জন্য আমার আত্মা তৃষ্ণার্ত, আকুল। আমার কল্পনায় এ আনন্দ যেন বেহালার সুর-ধারার মতো। সুর একই সঙ্গে উচ্চগ্রামে ঝঙ্কৃত আবার কোমলও। এ যেন অগ্নিশিখা ভয়ংকর হয়ে এল, তীব্র লেলিহ হয়ে উঠলো ; আমাকে আর আলিসাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল, খাঁটি করে দিয়ে গেল। আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম শুভ্র সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। এই কথাই বলা হয়েছে সেই দিব্য আবির্ভাবে (সন্ত জোহানের কাছে এই দিব্য আবির্ভাব হয়েছিল—অনু)।

হাত ধরাধরি করে চলেছি, এক লক্ষ্য আমাদের ; যদি শিশুসুলভ এ স্বপ্নে হাসি মুখে ফুটে ওঠে তাতেই বা ক্ষতি কি ?···যেমন মনে

পড়ছে, তেমনি আমি লিখে যাচ্ছি, অদল-বদল তো করছি না। শুধু শব্দের ব্যবহারে আর আবছা ছবিতে অসঙ্গতি রয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সেদিনকার সে অনুভূতি তো ছিল অতি সুস্পষ্ট।

কয়েকজন মাত্র তা খুঁজে পায়, পাদ্রী শেষ করলেন। তিনি বুঝিয়ে বললেন, কি করে সেই সংকীর্ণ তোরণদ্বার খুঁজে পাওয়া যায়।
···কয়েকজন মাত্র পায়—আমি হব তাদেরই একজন···উপাসনা শেষে আমার নীতিবোধ এমন জেগে উঠলো যে, ওর সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়ে এলাম—হয়তো আমার গর্বেই তা সম্ভব হোল, আমার প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা করতেই ইচ্ছা হোল, (প্রতিজ্ঞা তখন আমি করে ফেলেছি)। আর ভাবছিলাম, ওকে আমি এমনি যোগ্যতা দিয়েই জিনে নেব।

দুই

এই কঠোর বাণী আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করলো, আমার আত্মা তখন স্বভাবতই কর্তব্যমুখী। আমার বাবা-মার উদাহরণের সঙ্গে যুক্ত হোল কঠোর শৃঙ্খলা। আমার অন্তরের ভাবাবেগের প্রথম উন্মেষ তো এমনি করেই দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। এখানে যাকে 'ধর্ম' বলব, তার দিকেই ঝুঁকে পড়লাম। অন্যের উচ্ছৃঙ্খলতার মতোই আত্মসংযম আমার কাছে সহজ। স্বাভাবিক, যে-কঠোরতা আমি গ্রহণ করলাম, সে তো আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে দেখা দেয়নি; বরং আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। ভবিষ্যতের সুখ তো তখন আমি ততো চাইনি, যত ছিল তাকে লাভ করবার অদম্য প্রচেষ্টা। মনে এরই মধ্যে ধর্ম আর সুখকে একাকার করে ফেলেছিলাম। চৌদ্দ বছরের আর সব ছেলের মতো আমি তখনো অপরিণত, নমনীয়। কিন্তু আলিসার প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে প্রেরণা দিলে, যাত্রাপথে টেনে নিয়ে চললো। অন্তরে হঠাৎ আলোর ছটা খেলে গেল, নিজেকে চিনলাম। দেখলাম, ভাবনা-বিভোর, অর্ধপক্কোদ্গত এক অদ্ভুত জীব, অন্যের প্রতি কিছুটা বা উদাসীন, কিছুটা বা উদ্যমবিহীন। —আত্মা ছাড়া অন্য বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। বই-ই আমার প্রিয়, যেসব খেলায় ভাবতে হয় তাতেই আমার আনন্দ। ইস্কুলের সহপাঠিদের পরিবেশে আমার আনাগোনা কম। ওদের আমোদ প্রমোদে যখন অংশ নিই, সে তো শুধু স্নেহে বা আমার সৎস্বভাবের গুণে। তবু আবেল ভত্তিয়ের সঙ্গে তার পরের বছরই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সে পারীতে এসে আমার ক্লাসেই ভর্তি হোল। কুঁড়ে ছেলে, ভালই ওকে লাগতো—ওর উপর শ্রদ্ধার

চেয়ে আমার ভালবাসাই ছিল বেশী। যাইহোক, ওর সঙ্গে অন্তত ফোঁগেসমিরের আর লা-হাভার-এর দু-একটা কথা তো বলা যেত। ওখানে তো অবিরাম উড়ে উড়ে যেত আমার ভাবনা।

আমার মামাতো ভাই রোবার্ত বুকোলেঁাকেও ঐ এক ইস্কুলেই পাঠান হয়েছিল। ও দুক্লাস নীচে পড়তো, ওর সঙ্গে শুধু রোববারেই দেখা হোত। ও যদি আমার মামাতো বোনদের ভাই না হোত, আমি তো ওর সঙ্গে মিশে আনন্দই পেতাম না। অবশ্য ওদের সঙ্গে ওর ছিল ঘোর অমিল।

আমি তখন ভালবাসায় বভোর। এই প্রেমের মূল্যমানেই বন্ধুত্বের দাম যাচাই হয়েছিল। বাইবেলে সেই যে বহুমূল্য মুক্তার গল্প শুনেছি, আলিসা ছিল সেই মুক্তাটি। আমি যেন সেই মানুষের মত, যে সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছিল ঐ মুক্তা কেনার জন্যে। আমি তখনও শিশু, তাই ভালবাসার কথা বলা, আমার মাসতুতো বোনের প্রতি আমার এ অনুভূতির ঐ নাম দেওয়াও কি দোষ? কিন্তু পরে ঐ নামে যত অভিজ্ঞতা হয়েছে, এর চেয়ে তো তাদের বেশি মর্যাদা দিতে পারিনি। বরং যখন আমি বড় হলাম, দেহের কামনা যখন স্পষ্ট করে অনুভব করলাম, আমার এ অনুভূতি তো তখনো বদলায়নি। আমি তো ওকে তেমন ভাবে পেতে চাইনি, ছেলেমানুষ বয়সে তো ওর সাহচর্যই চেয়ে ছিলাম। আমার সমস্ত কাজ, সমস্ত প্রয়াস আমি আলিসাকে সমর্পণ করেছিলাম—এ এক রহস্যময় সমর্পণ বটে—আর আবিষ্কার করেছিলাম ধর্মের এক সূক্ষ্ম রূপ। তাতে করে ওর জন্যে যা করতাম, ওর কাছ থেকে লুকিয়েই রাখতাম। এমনি করে যেন বিনতির ধুম্রলোকে আমি মাতাল হয়ে গেলাম, অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। হায়, আমার নিজের সুখ সম্বন্ধে তখন আমি উদাসীন! যাতে প্রয়াস নেই তাতে যেন আমার তখন সন্তোষও নেই।

শুধু কি আমিই পেলাম এই আত্মোন্নতির প্রেরণা? মনে তো হয় না, আলিসাকে সে স্পর্শ করতে পারলে। অথবা ও আমার জন্যে কিছু করলে। কিন্তু আমার চেষ্টা তো তখন ওর জন্যেই। ওর ঐ ছলনাবিহীন নিষ্পাপ আত্মা তো তখন স্বভাব সৌন্দর্য্যময়। ওর মনের ধর্ম তো তখন বিলাসসুখ, সেখানে দেখা দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য, আর লাবণ্যের ঢল নেমেছে। ওর দৃষ্টির গাম্ভীর্য শিশুসুলভ হাসিতে নন্দিত, সুন্দর। মনে পড়ে, ও যখন জিজ্ঞাসায় তুলতো চোখ—নম্র কোমল হয়ে উঠতো ওর দৃষ্টি। বুঝতে পারি, আমার মামা কেন দুঃখে চাইতেন তাঁর বড়মেয়ের সাহায্য আর পরামর্শ। পরের বার গ্রীষ্মকালে তো দেখেছি, মামা প্রায়ই ওর সঙ্গে গল্প করতেন। দুঃখে তিনি বড় বুড়িয়ে গেছেন; খাবার সময় কম কথাই বলতেন; আবার সময়ে সময়ে এমন কষ্টকল্পিত আনন্দের বান ডাকিয়ে দিতেন—তাঁর নিস্তব্ধতার চেয়ে তাতে বেশি করে ব্যথাই দিত। সন্ধ্যা অবধি নিজের বসবার ঘরে ধুমপান করে কাটাতেন। তারপর আলিসা যেত ওঁকে নিয়ে আসতে। বাইরে বেরুবার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে হোত; ছোট ছেলেমেয়ের মতোই তাঁকে হাত ধরে বাগানে নিয়ে যেত সে। দুজনে ফুলের কেয়ারীর মাঝখানের পথ দিয়ে যেতেন সেই সিঁড়ির কাছে—যেখান দিয়ে নেমে যেতে হয় খিড়কির বাগানে। সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পেতে রেখেছিলাম আমরা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা, বাইরে বড় একটা বীচ গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুয়ে বই পড়ছিলাম। শুধু ফুলের কেয়ারীর মাঝখানে ব্যবধান ছিল লরেল লতার ঝোপটুকু। আমাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু শুনতে আমি পাচ্ছিলাম। আলিসা আর মামার স্বর আমার কানে ভেসে এল। ওরা রোবার্তের কথাই বলছিল, হঠাৎ শুনলাম, আলিসা আমার নাম করলে। সবে ভাল করে শোনার জন্যে কান পেতেছি, মামা চেঁচিয়ে উঠলেন।

হাঁ, ওতো সব সময়েই কাজ নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

অনিচ্ছুক শ্রোতা আমি। প্রথমে চলে যেতেই চাইলাম, অথবা একটু নড়ে চড়ে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে দেবার ইচ্ছে হোল। কিন্তু কি করবো ? না, চেঁচিয়ে বলবো, 'আমি এখানে আছি, তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি।' কিন্তু কৌতূহলের থেকে নিজের এই অবস্থা আর লজ্জাই আমাকে আরো শুনতে বাধ্য করলে। চুপ করে রইলাম। তা ছাড়া, ওঁরা বেড়াতে বেড়াতে চলে যাচ্ছেন, ওঁদের অস্পষ্ট কথাই শুনছি। কিন্তু এবার ওঁরা চলেছেন আস্তে আস্তে ; আলিসার কাঁধে নিশ্চয়ই হাল্কা একটা বাস্কেট ঝোলানো—ঐ তো ওর অভ্যেস। সে বিবর্ণ ফুলের গোছার মাথাগুলি কেটে নিচ্ছে, কাঁচা ফলগুলো তুলছে মাচার নীচ থেকে। সমুদ্রের কুয়াশায় ঝরা ফল। ওর স্পষ্ট স্বর শুনতে পেলাম।

বাপি, প্লাতিয়েঁ' পিসেমশাই কি একজন উঁচুদরের মানুষ।

মামার স্বর নিচু, অস্পষ্ট, উত্তরটা বোঝা গেলনা। আলিসা পেড়াপীড়ি করছে, খুব উঁচুদরের মানুষ বলে তোমার মনে হয় ?

আবার অস্পষ্ট উত্তর। আবার আলিসার স্বর।

জেরোম বেশ চটপটে, তাই না ?

…না শুনে কি পারি ? কিন্তু না, কিছুই বোঝা তো গেল না। সে আবার বললে, তোমার কি মনে হয় ও বড় হবে ?

মামা এবার জোরে বলে উঠলেন ; প্রথমে জিজ্ঞেস করছি, 'বড়' বলতে তুমি কি বোঝ। কেউ কেউ মানুষকে না দেখিয়েও বড় হয়—ঈশ্বরের চোখে তখন সে বড়।

আমি সেই কথাই বলেছি, আলিসা বললে।

এখনো সেকথা বলার সময় হয়নি, ওতো বড় ছেলেমানুষ। হাঁ, তবে আশা আছে, কিন্তু সেইটেই তো বড় কথা নয়।

আর কি চাই ?

জানিনা। হয়তো আত্মবিশ্বাস চাই, চাই অবলম্বন—ভালবাসা।

অবলম্বন বলতে কি তুমি বোঝাতে চাও? আলিসা বাধা দিয়ে বললে।

আমি যে স্নেহ আর শ্রদ্ধা পাইনি, মামা বিষণ্ণ স্বরে বলে উঠলেন। এবার ওঁদের স্বর একেবারে মিলিয়ে গেল।

সেদিন সান্ধ্য প্রার্থনার সময় আমার এই অনিচ্ছাকৃত আড়ি পাতার জন্যে অনুতাপ হোল। ভাবছিলাম বোনের কাছে স্বীকার করবো। হয়তো এবারে আমার এই প্রতিজ্ঞায় ছিল অনেকখানি কৌতূহল।

প্রথম কথাটা বলতেই ও বলে উঠলো,

জেরোম, অমন করে কারো কথা শোনা তো অন্যায়। তুমি যে ওখানে আছ একথা বলা উচিত ছিল। নয়তো চলে যেতে।

সত্যিই আমি শুনিনি, ইচ্ছে ছিলনা, তবু কানে এসেছে। তোমরা তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে।

আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম।

হাঁ, কিন্তু কথা তো এক রকম শুনিইনি। তখুনি বইয়ে মন দিলাম। আচ্ছা, মামাকে যখন বড় হবার জন্যে কি দরকার জিজ্ঞেস করছিলে, তিনি কি উত্তর দিলেন?

জেরোম, সে হেসে বললে, তুমি বেশ ভাল করেই শুনেছ, নিজের ভাল লাগছে বলে আমাকে আবার কথাটা বলতে বলছ।

শুধু গোড়ার দিকটাই শুনেছি—তিনি যখন বিশ্বাস আর ভালবাসার কথা বলছিলেন।

আরও বহু জিনিসের দরকার তাই বললেন।

তুমি কি উত্তর দিলে?

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল।

তিনি যখন অবলম্বনের কথা বললেন, আমি জবাব দিলাম ওর তো মা রয়েছেন।

আলিসা তুমি তো জান, মাকে তো সবসময়ে পাবনা। না, সে কথা তো নয়।

ও মাথা নিচু করলে।

উনিও সেই কথাই বললেন।

ওর হাতখানা ধরলাম, কঁাপছি তখন।

আমি যা হবো সে তো তোমারই জন্যে।

আমার আত্মা যেন সঞ্চারিত হোল আমার কথায়।

তোমাকে আমি তো ছেড়ে দেব না।

ও কাঁধটা একটু তুললো।

একা চলার কি তোমার শক্তি নেই ? আমরা সবাই আলাদা আলাদাভাবে ভগবানকে পাব।

কিন্তু পথ তো তুমি দেখাবে।

খৃষ্ট ছাড়া তুমি আর পদপ্রদর্শক হিসেবে কাকে চাও ? যখন ভগবানকে ডাকি তখনই তো আমরা দুজনে দুজনকে কাছে পাই।

হাঁ, তিনি আমাদের মিলিয়ে দেবেন, তাইত দিনে আর রাতে আমি কামনা করি।

ভগবানকে ডাকতে কি তুমি জান না ?

জানি, আমার সমস্ত মন বোঝে। তার মানে তো মনের ঘন আনন্দে সমস্ত সত্তা যখন এক হয়ে উপাসনা করে। তোমার সঙ্গে মিলবো বলেই তো আমার এই উপাসনা। তুমি উপাসনা কর বলেই তো আমার এই উপাসনা।

তাহলে সে তো পবিত্র নয়।

আমার কাছ থেকে এর বেশী কিছু চেয়ো না। তুমি যে-স্বর্গে থাকবে না সে-স্বর্গও আমার কাছে তুচ্ছ।

সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললো,

তুমি প্রথমে ভগবানের ন্যায়ের রাজ্যের সন্ধান কর।

আঁদ্রে জিদ্

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে, যাঁরা বোঝেন কিছু কিছু ছেলেমেয়ে বেশ গম্ভীর ভাবেই আলাপ করে, তাঁদের কাছে এগুলি শিশুসুলভ বলে মনে হবে না। আমি কি করবো বলুন? এগুলিকে বাদ দেব। না, বাদও দেব না, আর স্বাভাবিক করতে গিয়ে রংও ফলাব না।

আলিসা আমার সঙ্গেই ভাইকে সাহায্য করার ছুতোয় লাতিন পড়তো। আমার মনে হয়, আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যেই ওর এই পড়া। আর ওর সঙ্গ না পেলে।কোনো কিছু পড়াতেই আমি আনন্দ পেতাম না। আমার পক্ষে মাঝে মাঝে এ এক বাধা হলেও তেমন কিছু তো নয়। আমার মানসিক বিকাশে হয়তো অন্তরায় সৃষ্টি হোত, কিন্তু অন্যদিকে ও যেন থাকতো আমার সবখানি জুড়ে। আমার মনও চলত ওরই নির্দ্দেশ ধরে, আর আমরা যাকে তখন ভাবনা বলতাম, সে তো ছিল সঙ্গদানের সূক্ষ্ম ছলাকলা মাত্র। সেখানে শুধু অনুভূতির ছদ্মবেশটাই ছিল, ছিল ভালবাসার আড়াল আবডাল।

মা প্রথমে বোধহয় এই অনুভূতি সম্পর্কে শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এর গভীরতা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর শক্তি তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তিনি আমাদের দুজনকে মাতৃত্বের উদ্বেল স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরতে ভাল বাসতেন। হৃদরোগে তিনি ভুগছিলেন, সেই রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। একবার বাড়াবাড়ি হতে আমাকে কাছে ডেকে পাঠালেন।

বললেন, বাছা, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি। কোনদিন হঠাৎ তোমাকে ছেড়ে যাব।

থামলেন ; নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি হঠাৎ বলে উঠলাম অদম্য আবেগে—বুঝি বা উনিও অমনি কিছু আশা করেছিলেন।

মা-মণি, তুমি তো জানো আমি আলিসাকে বিয়ে করতে চাই।

আমার এই কথা তো ওঁরই গোপন কামনার আবৃত্তি। তিনি অমনি বলে উঠলেন :

জেরোম, সেই কথাই আমি বলতে চাই।

মা-মণি, ফুঁপিয়ে উঠলাম; তোমার কি মনে হয় ও আমাকে ভালবাসে ?

হাঁ বাছা, হাঁ। তিনি বার-কয়েক আউড়ে গেলেন, হাঁ বাছা হাঁ। অতিকষ্টে কথা বলছিলেন। আরো বললেন, ভগবানের ইচ্ছা ! ওঁর উপরে ঝুঁকে পড়তেই উনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন,

আহা, ভগবান তোমাদের ভাল করুন ! দুজনেরই ভাল করুন ! তারপর তন্দ্রায় ঢুলে পড়লেন, আমি আর জাগাতে চেষ্টা করলাম না।

একথা নিয়ে আলাপ আর হয়নি। পরদিন মা একটু ভাল ছিলেন। আমি ইস্কুলে চলে গেলাম, আবার এই গোপন মনের কামনার উপর নীরবতা ঘনিয়ে এল। আর আমি কিই বা জানতাম ? আলিসা যে আমাকে ভালবাসে এ বিষয়ে তো অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যদি বা থাকতো, তারপরে যে ঘটনা ঘটলো তাতে তো সে সন্দেহ চিরদিনের জন্য মিলিয়ে যেত।

মা নিঃশব্দে এক সন্ধ্যায় চলে গেলেন। আমি আর মিস্ আসবার্টন তখন তাঁর কাছে, রোগের যে আক্রমণে তিনি চলে গেলেন, আর আর বারের চেয়ে তা তেমন প্রচণ্ড তো হয়নি। শুধু শেষের দিকে বাড়লো ভয় ; আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়া হোল না। আমাদের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে মার মৃতদেহের পাশে রাত কাটালাম। মাকে খুবই ভালবাসতাম। তাই অবাক হলাম, চোখে জল ঝরছে বটে, কিন্তু মনে দুঃখ তো খুবই কম। যদিবা কাঁদলাম সে শুধু মিস্ আসবার্টনের প্রচণ্ড সমবেদনায়—করুণায়। তাঁর চেয়ে কত ছোট তাঁর মিতিনীকে ঈশ্বর এমনি ভাবে তাঁর আগেই নিয়ে গেলেন। কিন্তু

আমার গোপন কামনা তখন দুঃখকে ছাপিয়ে উঠেছে। এই শোক তো আমাদের মধ্যে তাড়াতাড়ি একটা বোঝাপড়া করিয়ে দেবে।

মামা এলেন পরদিন সকালে। আমার হাতে মেয়ের লেখা চিঠিখানা দিলেন। ও এল প্লাতিয়েঁ মাসীর সঙ্গে তার পরের দিন।

জেরোম, বন্ধু ভাই, (সে লিখেছে)

···ওর সঙ্গে যে মৃত্যুর আগে দুটো কথা বলতে পারলাম না, এর জন্যে যে আমার দুঃখের সীমা নেই। উনি তো ওঁর আকাঙ্ক্ষিত পরম সুখ পেতেন সেই কথায়। উনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর এখন থেকে ভগবানই যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। আহা, বেচারী বন্ধু আমার, আজ আসি,

আগের চেয়েও স্নেহধন্যা
তোমার—আলিসা

এ চিঠির অর্থ কি? কি কথা সে বলতে পারেনি বলে তার দুঃখ —সে কথা তো আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না? আমি এখনো ছেলেমানুষ, এখুনি তো বিয়ের কথা বলা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া ওর প্রতিশ্রুতির কি প্রয়োজন? আমরা কি এক রকম বাগ্‌দত্ত নই? আমাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তো আমাদের ভালবাসা আর গোপন নেই। আমার মা যেমন চাইতেন, মামাও তেমন চান। আবার তিনি তো আমাকে ছেলের মতোই দেখেন।

ঈস্টারের ছুটি লা-হাভারএ কাটিয়ে এলাম। প্লাতিয়েঁ মাসীর ওখানে শুতাম, খেতাম বুকোলেঁা মামার ওখানে।

মাসিমা ফেলিসি প্লাতিয়ে চমৎকার মহিলা। কিন্তু আমার মামাতো ভাই-বোনেরা আর আমি তাঁর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ ছিলাম না। তিনি সবসময়েই ব্যস্ততায় নিঃশ্বাস-রুদ্ধ হয়ে থাকতেন; ভাবভঙ্গী ছিল বড় অভদ্র, স্বরটাও গীতধর্মী নয়। আমাদের আদরে সোহাগে

তিনি বিব্রত করে তুলতেন, আর অসময়েই তাঁর এই স্নেহের আবেগ চেপে বসতো, হঠাৎ আমাদের স্নেহের বন্যায় অভিভূত করে ফেলতেন। বুকোলেঁ। মামা ওকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ে শুধু স্বর শুনেই বোঝা যেত মাকে তিনি পছন্দ করতেন আরো বেশি।

একদিন সন্ধ্যেয় মাসিমা বললেন, বাছা, এবার গ্রীষ্মে কি করবে জানিনা। নিজে ঠিক করবার আগে তোমারটা শুনতে চাই। দেখি যদি তোমার কোনো উপকার হয়।

এখনো ভাবিনি, তবে বেড়াতে বোধ হয় যাব।

তিনি বলে চললেন,

তুমি তো জানো, এখানে বা ফোঁগেসমিরে তুমি সব সময়েই আসতে পারবে। তোমার মামা আর জুলিয়েৎ তাতে খুশিই হবেন।…

আপনি আলিসার কথা বলছেন তো?

হাঁ, হাঁ। কি ভুল দেখ দিকি। তা তুমি কি বিশ্বাস করবে বাছা? আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম, তুমি জুলিয়েতের সঙ্গে প্রেমে পড়েছ। এই মাসখানেক হোল—তোমার মামা সব বললেন। জানতো তোমাদের সবাইকে আমি বড় ভালবাসি! কিন্তু তোমাকে আমি খুব কমই দেখেছি। আর আমার নজরও তেমন কড়া নয়। অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময়ও নেই। তোমাকে তো জুলিয়েতেরই সঙ্গেই খেলা করতে দেখতাম, তাই ভাবতাম—আহা অতো সুন্দর, অতো আমুদে মেয়েটা—

হাঁ, এখনো ওর সঙ্গে খেলা করতে আমার ভাল লাগে, কিন্তু আলিসাকে আমি ভালবাসি।

তা বেশ, বেশ! তোমার ব্যাপার, তুমিই ভাল বুঝবে। আমি তো ওকে একরকম চিনিই না। ওর বোনের চেয়ে ও কথা

কয় কম। মনে হয়, যখন পছন্দ করেছ, তখন কারণ তো আছেই।

মাসিমা, আমি ওকে ভালবাসবো বলে তো পছন্দ করিনি— কখনো ভাবিনি—কেন যে ওকে—

জেরোম, বাছা, রাগ কোরোনা। আমার মনে অত ঘোরপ্যাঁচ নেই। যা বলতে চেয়েছিলাম, সব ভুলে বসে আছি। ও হাঁ, তোমাদের বিয়ে তো হবেই। কিন্তু এই শোকের সময়ে বাগ্‌দত্ত হওয়া তো ঠিক হবে না—তাছাড়া তোমরা দুজনেই বড় ছেলেমানুষ। এখন যখন তোমার মা বেঁচে নেই, ফোঁগেসমিরে গিয়ে তোমার থাকা তো ঠিক হবে না।

মাসিমা, তাইত বেড়াতে যাবার কথা বলছি।

তা বাছা, আমি থাকলে সব সহজ হয়ে যাবে। তাই গরমকালটার ক'টা দিন হাতে রেখেছি।

মিস্ আসবার্টনকে যদি বলি, তিনিও নিশ্চয়ই রাজি হবেন।

সে তো আসবেই জানি। কিন্তু তাতে তো হবে না! আমিও যাব। এমন কথা বলছিনে যে তোমার মার জায়গা নেব হঠাৎ তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, কিন্তু ঘর-গেরোস্থালি তো দেখতে পারব। তোমার মামা বা আলিসার তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

ফেলিসি মাসিমা নিজের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভুল করেছিলেন। সত্য বলতে গেলে, আমরা শুধু অস্বস্তিই ভোগ করছিলাম। ঘোষণা অনুসারে উনি এসে জুলাইয়ের প্রথমেই ফোঁগেসমিরে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। তার কিছু পরেই এলাম আমি আর মিস্ আসবার্টন।

আলিসাকে সাহায্যের ভান করে তিনি শান্ত বাড়িখানাকে অবিরাম সোরগোলে ভরে তুললেন। আমাদের সন্তুষ্ট আর খানিকটা সুবিধা করে দেবার উৎসাহে এমন বাড়াবাড়িই করে ফেলতে

লাগলেন যে, আলিসা আর আমি ওঁকে দেখলেই বিব্রত হয়ে পড়তাম, কথাও বন্ধ হয়ে যেত। উনি নিশ্চয়ই ভাবতেন, আমরা খারাপ ব্যবহার করছি।……চুপ করে যদি নাও যেতাম, উনি কি আমদের ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে পারতেন? আর একদিকে জুলিয়েতের স্বভাবটি ওঁর এই আতিশয্যের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওঁর ছোট বোনঝি'র উপর অতো টান দেখে মাসিমার প্রতি আমার ভালবাসায় খানিকটা বা ভাঁটা পড়লো।

সকালে সেদিন ডাক-বিলি হয়ে গেছে, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাছা জেরোম, আমার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। মেয়ের অসুখ, আমাকে দেখতে চায়। তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে……

আমার মন অকারণ সংস্কারে তখন স্ফীত। মামার খোঁজ করলাম, মাসিমা চলে যাবার পর ফোঁগেসমিরে থাকব কি থাকব না তা তো তখন বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার প্রথম কথায়ই:

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কি বললে? আমার বোন কি সহজ ব্যাপারটাকে এমন জটিল করে তুলতে চাইছেন? জেরোম, তুমি যাবে কেন? তুমি কি এরই মধ্যে আমার আপন সন্তানের মতো হয়ে ওঠনি?

মাসিমা ফোঁগেসমিরে একপক্ষকালের বেশী রইলেন না। উনি চলে যাবার পরই বাড়ী আবার আগের সেই নির্জনতায় ভরে গেল। আবার সেই শান্তি ফিরে এল, যাকে সুখও বলা যায়। আমার দুঃখ ভালবাসায় ছায়া ফেলতে পারেনি, কিন্তু তাকে তখন গুরুভার করে তুলেছে। মামুলী জীবন তখন একঘেয়ে স্রোতে বয়ে চলেছে, কিন্তু তবু মনে হোত, এর কোথায় যেন আছে

উচ্চ সুর-ঝঙ্কারের শিখর—তাই তো আমাদের হৃদয়ের ক্ষীণ স্পন্দনও তখন শোনা যেত। মনে আছে, মাসিমার চলে যাবার পরেই আমরা এক সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার টেবিলে বসে ওঁরই কথা আলোচনা করছিলাম।

আমরা বলছিলাম, কি সোরগোলই না তুলেছিলেন! জীবনের স্পন্দন কি ওঁর আত্মাকে একটু বিরাম দেবেনা—এও কি সম্ভব? ওগো সুন্দর প্রেম, তোমার প্রতিবিম্ব কোথায় গেল?···আমাদের মনে পড়ছিল, মাদাম দ্য স্তাইন সম্পর্কে গোয়্‌টের উক্তি: 'ঐ আত্মায় সমস্ত জগতকে প্রতিফলিত দেখতে পেলে সে হবে কত সুন্দর।' আমরা তাই নিজেদের এক গোষ্ঠি তৈরী করলাম, সেখানে ভাবুকতাকে দিলাম উচ্চ স্থান। মামা চুপ করেই ছিলেন, এবার ম্লান হেসে আমাদের ভর্ৎসনা করলেন।

বললেন, ভেঙেচুরে গেলেও ভগবান তাঁর প্রতিমূর্তি চিনতে পারেন। মানুষের জীবনের মুহূর্ত নিয়ে তাকে বিচার করতে যাওয়া ভুল। এ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়াই ভাল। আমার দুঃখী বোনটির যা-কিছু তোমাদের অপছন্দ, সবই অবস্থার চাপে হয়েছে! আমি জানি বলেই তোমাদের মতো এমন নিষ্ঠুর সমালোচনা করতে পারছি না। যৌবনের এমন কোনো জিনিস তো নেই যা বার্ধক্যে ক্ষয় হয়ে যায় না। তোমরা ফেলিসির যাকে 'ব্যস্ততা' বল, এক সময়ে তাই ছিল ওর প্রাণের প্রাচুর্য। সে প্রাচুর্য ছিল কত সুন্দর, স্বতঃস্ফূর্ত, তাতে যেমন ছিল উদ্দামতা, তেমনি কমনীয়তা। আমরাও তোমাদের মতই ছিলাম, কোনো তফাৎ ছিল না। জেরোম, আমি তো ছিলাম তোমারই মতো—হয়তো কল্পনায় যতটুকু ভাবি—তার চেয়েও বেশী। এখন জুলিয়েৎ যেমনটি—ফেলিসি ছিল তেমনি দেখতে। হাঁ, চেহারার দিক থেকেও তাই—আমি তো জুলিয়েতের ভিতরে ওর সাদৃশ্য দেখে চমকেই উঠি!

আঁদ্রে জিদ্

তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমার স্বরে কখনো কখনো ওর সেই স্বর শুনতে পাই, তোমার হাসিও যেন ও পেয়েছিল, আর তোমার মতো চুপ করে বসে থাকার স্বভাবও ওর ছিল, তখন ওর কনুইয়ে ভর দিয়ে মুঠো-করা হাতের উপর কপালখানা চেপে ধরতো। আজ সে স্বভাবগুলো ও হারিয়ে ফেলেছে।

মিস আসবার্টন আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করেই বললেন, আর আলিসা তোমার মার মতোই হয়েছে।

সেবারের গ্রীষ্মকালটি ছিল চমৎকার। সারা পৃথিবী যেন তখন নীলে নীল হয়ে গেছে! আমাদের মনের উৎসাহ মনের পাপ জয় করেছে, মৃত্যু-বিজয়ী হয়েছে। ছায়া সরে সরে যাচ্ছে আমাদের সুমুখ থেকে। রোজ ভোরে জেগে উঠি আনন্দের আহ্বানে। খুব ভোরে উঠি, আগতদিনকে অভ্যর্থনা করি···সেদিনের কথা! যখন ভাবি, সে তো যেন তেমনি নবীন শিশির-স্নাত হয়েই দেখা দেয়। জুলিয়েৎ ওর বোনের চেয়ে সকালে উঠতো। ওর বোনের ছিল বেশী রাত জাগার অভ্যাস। ও তাই সকালে বাগানে আসতো আমার সঙ্গে। ও ছিল আমার আর বোনের দূতী। ওর কাছে অবিরাম বলে যেতাম আমাদের ভালবাসার কথা, শুনতেও ওর ক্লান্তি ছিল না। আলিসাকে যা বলতে সাহস করতাম না, ওকে তাই বলতাম। ভালবাসা আমাকে সংযত আর লাজুক করে দিয়েছিল। আলিসারও এতে সায় ছিল। ওর বোনের কাছে যে আমি সব কথা খুলে বলতে পারি এতেই ছিল ও সুখী। ও ভুলে যেত বা ভুলে যাবার ভান করতো যে আমরা ওর কথাই বলছি।

ভালবাসার একি সুন্দর ছলনা, একি আতিশয্য—কোন্ আড়াল-আবডালের পথ দিয়ে তুমি আমাদের নিয়ে চল হাসি থেকে অশ্রুতে, অকৃত্রিম আনন্দ থেকে ধর্মের পথে!

আঁদ্রে জিদ্

গ্রীষ্ম চলে গেল। নির্মল গ্রীষ্ম। আমার স্মৃতিতে শুধু দ্রুত চলে-যাওয়া দিনের স্মৃতিই রয়ে গেছে, আর কিছুই নেই। আলাপ-আলোচনা, পড়াশুনোয় সেদিনগুলি ভরা।

ছুটির শেষদিকে এক সকালে আলিসা আমাকে বললে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমি বেঁচে আছি, তুমি যেন মারা গেছ। না তোমাকে মরতে দেখিনি। শুধু দেখেছি—তুমি মারা গেছ। কি ভয়ানক! এ এত অসম্ভব যে আমি স্বপ্ন থেকে যে গরহাজির ছিলাম এতেই খুশি। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, তবু মনে হোল তোমার কাছে যেতে পারব। কি করে যাব তারই পথ খুঁজতে লাগলাম। সফল হবার জন্যে এমন চেষ্টাই চললো, যাতে ঘুম ভেঙে গেল।

আজ ভোরে তো সেই স্বপ্নের ঘোরেই কাটাচ্ছি। এখনও যেন কাটেনি সে-ঘোর। মনে হচ্ছিল, তোমার কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—হয়তো দীর্ঘ—দীর্ঘ দিনের জন্যেই এমনি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। স্বর নামিয়ে নিয়ে সে এবার বললে, আমার সমস্ত জীবন ধরে—আমাদের সমস্ত জীবন ধরে এক চরম প্রচেষ্টা করতে হবে···

কেন?

প্রচেষ্টা করতে হবে আমাদের মিলনের জন্য।

ওর এই কথার তাৎপর্য বুঝতে চাইলাম না, বুঝি-বা ভয়ই হোল। বুক দুরু দুরু করছে তখন, তবু হঠাৎ সাহস ভরেই বলে ফেললাম—বুঝি-বা প্রতিবাদই করলাম:

আজ ভোরের দিকে আমিও স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। এমন ধ্রুব সে-স্বপ্ন যে, কিছুই তো আর আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না। শুধু মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই তো পারবে না।

আঁদ্রে জিদ্

তোমার কি মনে হয় মৃত্যু বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে? ও শুধালো।

তার মানে এই—

আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়। বুঝি মৃত্যুই এ মিলন আনতে পারে। হাঁ, জীবনে যা কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল, তাকে তো মিলিয়ে দেয় মৃত্যু।

এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা এমন গভীরভাবে আমাদের মনে থিতিয়ে গিয়েছিল যে, আজও সেই কথার উচ্চারণভঙ্গী পর্যন্ত আমি শুনতে পাই। কিন্তু তার গুরুত্ব তো আমি সেদিন বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম অনেক পরে।

গ্রীষ্ম চলে গেল। এরই মধ্যে মাঠ রিক্ত হয়ে যেতে লাগলো। মাঠে মাঠে দীর্ঘ শূন্যতা। সেখানে আর তখন ফসলের সম্ভাবনা নেই। আমার চলে আসার আগের দিন সন্ধ্যায় নয়ত দু-একদিন আগে জুলিয়েতের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। খিড়কির বাগানের প্রান্তে যেখানে ঝোপঝাড় রয়েছে, দু-জনে সেখান অবধি চলে গেলাম।

ও জিজ্ঞেস করলে, আলিসার কাছে কাল কি আওড়াচ্ছিলে?

তার মানে?

ঐ যে যখন বেঞ্চির উপর দু-জনে বসেছিলে।

ওঃ, মনে পড়েছে! বোদলেয়ারের দু-একটি কবিতা আওড়াচ্ছিলাম।

ওগুলি কি? আমার কাছে বলবে না?

অনিচ্ছায় শুরু করলাম,

তুহিন শীতল অন্ধকার তো
আসবে ত্বরায়,
ঘিরে ঘিরে আসবে—ডুবে যাবে।

আঁদ্রে জিদ্

শুরু করতেই ও বাধা দিলে। কম্পিতস্বরে ছত্রের খেই ধরলে,

তাহলে বিদায়,

আমার ক্ষণিকের দীপ্ত জীবন !

স্বরও ওর বদলে গেছে।

কি, তুমিও জান ? আমি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি কাব্যের ধার ধার না।

কেন ? তুমি আমার কাছে কবিতা বল না বলে ? ও হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে বসলো, কিন্তু সে-হাসি যেন কষ্ট করে টেনে আনা। তুমি হয়তো কখনো কখনো ভাব, আমি একেবারে মূর্খ।

বেশ বুদ্ধিমান হয়েও কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা যায়। তোমাকে তো কখনো আওড়াতেও শুনিনি, আমাকেও আওড়াতে বল নি।

সে হচ্ছে আলিসার ব্যাপার-তাই, সে চুপ করে গেল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো—

তুমি পরশুই চলে যাচ্ছ ?

হাঁ, যেতেই হবে।

এবার শীতকালে কি করবে ?

নর্মাল ইস্কুলে এই আমার শেষ বছর !

আলিসাকে কবে বিয়ে করবে ?

সামরিক শিক্ষা শেষ করে আসি, তার আগে তো নয়। তাছাড়া, ভবিষ্যতে কি করবো তারও একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া চাই।

সে ধারণা এখনো হয়নি ?

এখনও ভাবতেই বসিনি। বহু জিনিসই আমার মন টানছে।

একটা পথ বেছে নিয়ে স্থির হয়ে বসাটাকে ঠেকিয়ে রাখতেই আমি চাই।

তার মানে স্থির হয়ে বসতে তোমার অনিচ্ছা, তাই তুমি বাগদানও দূরে সরিয়ে রাখছ।

উত্তর না দিয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলাম। ও পেড়াপীড়ি শুরু করলে,

তাহলে, অপেক্ষা করছ কেন? এখুনি বাগদান করে ফেলছ না কেন?

কেন বাগদান করবো আমরা? আমরা যে একজন আর এক-জনের, এইটেই কি যথেষ্ট নয়? এ কথা কি পৃথিবীতে ঘোষণা না করলে চলেনা? আমি আমার সমস্ত জীবন ওর জন্যে উৎসর্গ করব বলে স্থির করেছি, তুমি কি মনে কর, আমার এই ভালবাসাকে প্রতিশ্রুতির বন্ধনে বাঁধাটাই তার চেয়ে বড় কথা হবে?

না, তা আমি করব না। আমার কাছে প্রতিশ্রুতি তো ভাল-বাসার অপমান। ওকে যদি আমি অবিশ্বাস করতাম, তাহলেই বাগদান করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম।

আলিসাকে তো আমি অবিশ্বাস করি না—

ধীরে ধীরে চলছিলাম। বাগানের যেখানে এসে আমরা হাজির হলাম, এইখানেই একদিন আলিসা আর তার বাবার আলাপ আমার কানে এসেছিল। হঠাৎ আমার মনে হোল, আলিসাকে তো বাগানে আসতে দেখলাম। ও হয়তো এখন সিঁড়ির উপর বসে আছে, অমনি করে ও-ও শুনছে আমাদের কথা। যে কথা খোলাখুলিভাবে ওকে বলতে পারি নি, সেই কথা শোনাবার সম্ভাবনায় আমি প্রলুব্ধ হলাম; এই ছলনা নিজেরই ভাল লাগলো, স্বর চড়িয়ে বললাম:

যৌবনের এক অবরুদ্ধ উদগ্রতা যেন আমার চীৎকারে উৎসারিত হয়ে পড়লো, নিজেই বিভোর হয়ে গেলাম নিজের কথায়, জুলিয়েতের যে কথা না-বলা রয়ে গেল তখন সে সম্বন্ধে আমি উদাসীন। বলে উঠলাম—উঃ যাকে ভালবাসি যদি তার উপরে ঝুঁকে পড়ে, যেমন আরসীতে দেখা যায়, তেমনি করে নিজের ছায়া

দেখতে পেতাম! যদি নিজের মনের মতোই পড়তে পারতাম তার মনের ভাষা—নিজের থেকেও ভাল করে পড়তে পারতাম! তাহলে আমাদের ভালবাসায় দেখা দিত কত প্রশান্তি—কত পবিত্রতা!

জুলিয়েতের ভাবাবেগকে আমার এই উদাসীন বাগ্মিতারই ফল বলে মনে হোল। হাঁ, এতই তখন আমার গর্ব। ও হঠাৎ আমার কাঁধে মুখ লুকালো।

জেরোম, জেরোম! ও তোমাকে সুখী করতে পারবে এ সম্বন্ধে যদি নিশ্চিত হতে পারতাম! তোমার জন্যে ও যদি দুঃখ পায়, আমি তো তোমাকে ক্ষমা করবো না। ওকে বাহুদিয়ে জড়িয়ে ওর মুখখানি তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কেন জুলিয়েৎ, ও কথা বলছ কেন—নিজেকেই যে আমি ক্ষমা করতে পারব না। যদি তুমি জানতে! শুধু ওকে নিয়ে জীবন ভাল করে শুরু করব বলেই তো, এখনও নিজের পথ বেছে নিইনি। ওর উপরেই তো আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কেন তুমি কি জান না, এমন দিনতো আমারা চাইনে যাতে ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে!

ওকে এ কথা বললে ও কি বলে?

ওকে তো কখনো এ কথা বলিনি। কখনো না! আমরা যে কথা দিইনি এও তার এক কারণ বটে; বিবাহের প্রশ্নই এখনো ওঠেনি, ওঠেনি ভবিষ্যতের প্রশ্ন। জুলিয়েৎ, ওর সঙ্গে মিলিত জীবন এত সুন্দর যে আমি সাহস করিনি—বুঝেছ, কিছু বলতে সাহস করি নি।

তুমি চাও, হঠাৎ সেই পরম সুখের দিন ওর কাছে আসবে, ওকে চমক লাগিয়ে দেবে।

না, তাতো নয়। আমি ভয় পাচ্ছি, ওকে হয়তো ভয় পাইয়েই দেব। বুঝতে পারছ না? আমার ভয়, যে অসীম সুখের ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি সুমুখে, হয়তো ওতে ও ভয়ই পাবে। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বিদেশে ঘুরতে চায় কিনা।

ও বলেছিল, কিছুই চায় না। বিদেশ আছে, আর সে বিদেশ সুন্দর, সেখানে মানুষ যেতে পারে—এইটুকু জানাই ওর পক্ষে যথেষ্ট।

আর জেরোম, তুমি কি বাইরে যেতে চাও?

হাঁ, সর্বত্র যেতে চাই। সমস্ত জীবনটাই তো আমার কাছে এক দীর্ঘ ভ্রমণ। ওর সাহায্য, বই-পড়া, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, বিদেশ ভ্রমণ—সবই তো তার অঙ্গ। তুমি 'নোঙর-ফেলা' কথাটা নিয়ে কোনদিন ভেবে দেখেছ?

হ্যাঁ, প্রায়ই তো ভাবি। ও অস্ফুট-স্বরে বললে। কিন্তু ওর কথা বুঝি শুনতে পেলাম না, কথাগুলি আহত হতভাগ্য পাখির মতো লুটিয়ে পড়লো বুঝি মাটিতে। আমি বলে চললাম—

একদিন রাতে বেরিয়ে পড়ব; তারপর ভোরের উজ্জ্বলতায় জেগে উঠব। এই অনিশ্চিত প্রবাহে নিজেদের যুগল বলে মনে হবে, নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে আবার।

জুলিয়েৎ বললে, ছেলেবেলায় মানচিত্রে যে বন্দর দেখেছি, এসে সেখানেই পৌঁছিবে। সবই সেখানে অজানা, অদ্ভুত। কল্পনায় দেখছি, তুমি যেন জাহাজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছ, আলিসা তোমার হাত ধরে জাহাজ থেকে নেমে আসছে। হাসতে হাসতে বললাম, আমরা এবার ডাকঘরে ছুটবো। আমাদের কাছে হয়তো জুলিয়েতই লিখবে চিঠি।

সে চিঠি লিখবে সেই ফোঁগেসমির থেকে, সেখানে হয়তো তখনও সে পড়ে থাকবে, আর তোমাদের তাকে মনে হবে কত ক্ষুদ্র, কত ম্লান আর কতদূরে—

এই কথাই কি ও সেদিন বলেছিল? বলতে পারি না। আবার বলছি, আমি তখন এমন প্রেমময় যে নিজের প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু তখন আমি জানি না।

আমরা সিঁড়ির কাছে এসে গেলাম, ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময়

আলিসা ছায়াঘন কোণ থেকে আবির্ভূত হোল। ও এত ম্লান যে ওকে দেখে জুলিয়েৎ চীৎকার করে উঠলো।

আলিসা তাড়াতাড়ি বললে, কথা ওর জড়িয়ে গেল, হাঁ, শরীরটা ভাল নেই। যা ঠাণ্ডা হাওয়া! যাই—ভিতরেই যাই—তাই ভাল। সে তখুনি বাড়ির দিকে ছুটলো।

ও একটু দূরে যেতেই জুলিয়েৎ বললে, ও আমাদের কথা শুনেছে।

কিন্তু ও বিরক্ত হবে এমন কথা তো বলিনি। বরং—

ও কথা থাক, এই বলে সেও বোনকে ধরতে ছুটলো।

রাতে ঘুমোতে পারলাম না। আলিসা খাবার সময় নিচে নেমে এল, কিন্তু তার পরেই মাথা ধরার ভান করে চলে গেল। আমাদের আলাপের কোন্‌টুকু ও শুনেছে? উদ্বিগ্ন হয়ে, যা-কিছু বলাবলি করেছি মনে মনে আউড়ে গেলাম। তারপরে মনে হোল, জুলিয়েতের অতো কাছে কাছে যাচ্ছিলাম, ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম—আমার কি সেটা অন্যায় হয়েছে? কিন্তু এ তো ছেলেবেলার অভ্যেস, এমনিভাবে আলিসা তো আমাদের বেড়াতে দেখেছে। হায়; কি হতভাগ্য আমি, কি অন্ধ আমি, আমার নিজের ভুলগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম; একবারও কি তখন ভেবেছিলাম যে জুলিয়েতের সে-কথাগুলি বিন্দুমাত্র আমি শুনিনি, যা আমার এখন আবছা মনে আছে, সেইগুলিই আলিসা ভাল করে বুঝতে পেরেছিল। যাহোক্ উদ্বেগে আমি তখন বিপথগামী, আলিসা আমাকে অবিশ্বাস করে এই ভয়ে আমি ভীত, জুলিয়েতের কাছে যা বলেছি, আর ও আমাকে যা বলেছে, তারই প্রেরণায় আমার সংস্কারগুলো জয় করবো ঠিক করলাম। শঙ্কা চলে যাবে, আমি হব বাগ্‌দত্ত।

আঁদ্রে জিদ্

বিদায়ের ঠিক আগের এ ঘটনা। ভাবলাম, তাই ওর এই বিষণ্ণতা। ও যেন তখন আমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছিল। দিন বয়ে গেল, ওকে একা পেলাম না কথা বলার আগেই, হয়তো চলে যেতে হবে এই ভয়ে ওর ঘরে আমাকে রাতের খাওয়ার আগেই আসতে হোল। ও একটা প্রবালের মালা পরছিল গলায়, হাত দু-খানি তখন মালার গ্রন্থি বাঁধবার জন্য তোলা। ও দরজার দিকে পিছন ফিরে নুয়ে আছে। দুখানি মোমের মাঝখানে আরসীখানা। কাঁধের উপর দিয়ে সেখানে দেখছে গ্রন্থি বাঁধা হোল কিনা। আরসীতেই ও আমাকে প্রথম দেখলো, না ফিরেই কিছুক্ষণ ঐ দিকেই তাকিয়ে রইল, আমাকে দেখতে লাগলো।

কেন এলে? দরজা বন্ধ ছিল না? ও বললে।

আমি ধাক্কা দিলাম, উত্তর পেলাম না। আলিসা, জান, কাল চলে যাচ্ছি।

ও নিরুত্তর, মালাখানা খুলে রেখে দিল, গ্রন্থি-বাঁধা আর হোল না। 'বাগদান' কথাটা আমার কাছে বড় নগ্ন, নির্লজ্জ বলে মনে হোল, এ যেন বড় বর্বরতায় ভরা! তার বদলে কি পল্লবিত অলঙ্কার ব্যবহার করেছিলাম মনে করতে পারছি না আলিসা যখন তার তাৎপর্য বুঝতে পারলে, মনে হোল ও যেন টলে পড়লো, সামাদানের উপর হেলে পড়লো। আমি নিজেও তখন এত কাঁপছি যে ভয়ে ওর দিকে তাকাতে পারিনি— চাই নি।

ওর কাছেই ছিলাম আমি, চোখ না তুলে হাত ধরলাম। ও ছাড়িয়ে নিল না, কিন্তু মুখখানা একটু নিচু করে, আমার হাতখানা একটু তুলে, ও নিজের ঠোঁট তার উপর চেপে ধরলো। আধো-এলানো দেহে অস্ফুট স্বরে ও বললে,

না, জেরোম, না, আমাদের বাগদানের কথা বোলো না লক্ষ্মীটি!

আঁদ্রে জিদ্

আমার বুকে স্পন্দন তখন দ্রুততর, ও যেন তা বুঝতে পারলে, ও আমায় আরও কোমল করে বললে,

না, এখনো নয়—

ওকে শুধালাম,

কেন?

কেন? সে-কথা তো আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত, ও বললে। কেন পরিবর্তন হোল মতের?

কালকের আলাপের কথা বলতে সাহস পেলাম না। ও নিশ্চয়ই বুঝেছিল, সেই কথাই আমি ভাবছি। ও আমার দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে বললে,

প্রিয়, এ তোমার ভুল, ভুল! আমার তো অতো সুখের প্রয়োজন নেই। আমরা কি যথেষ্ট সুখী নই?

ও হাসবার বৃথা চেষ্টা করলে।

না, তা হবে না। আমাকে যে বিদায় নিতে হবে।

শোন, জেরোম, আজ সন্ধ্যেয় কোন কথা বলতে পারব না— আমাদের শেষ মুহূর্ত ক'টি অমনি নষ্ট করে দিও না। না, না, আগের মতোই আমি তোমাকে ভালবাসি—তুমি আমার তেমনি প্রিয়। ভয় পেও না, আমি চিঠি দেব—সব বুঝিয়ে বলবো। কথা দিচ্ছি—চিঠি দেব —কালই দেব—তুমি যেই চলে যাবে অমনি দেব। এখন একটু যাও তো! দেখছ না, আমি কাঁদছি। যাও! তোমাকে যেতে হবে।

ও আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে, নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিলে। সেই তো আমাদের শেষ বিদায়ের ক্ষণ। সে রাতে ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম না, পরদিন ভোরেও না। আমার যাবার সময় যখন এসে গেল, ও তখন নিজেকে ঘরে বন্দী করে রেখেছে।

জানালায় ওকে দেখতে পেলাম। ও দাঁড়িয়ে দেখছিল। গাড়ি চলা শুরু করতেই ও হাত নেড়ে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালে।

আঁদ্রে জিদ্

তিন

সে-বছর আবেল ভত্তিয়ের সঙ্গে তেমন দেখা হয়নি। ডাক আসার আগেই সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছিল। আমি ইতিমধ্যে ডিগ্রি-পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আবেলের চেয়ে আমি দু-বছরের ছোট! আমার সৈন্য-বিভাগের শিক্ষানবিশী নর্মাল ইস্কুল ছাড়বার পরেই করব বলে ঠিক ছিল। সেই বছরেই আমাদের নর্মাল ইস্কুলে ভর্তি হবার কথা।

আবার দেখা হোল, আনন্দ পেলাম। সৈন্য-বিভাগ থেকে সে মাসখানেকের বেশী ঘুরে বেড়িয়েছে। ওর খানিকটা পরিবর্তনের আশঙ্কা করেছিলাম। দেখলাম, দৃঢ়তা বেড়েছে বটে, কিছুমাত্র সৌকুমার্য নষ্ট হয়নি। বিদ্যালয় খোলার আগের দিন বিকেলটা আমরা লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে কাটিয়ে দিলাম। ওর কাছে চেপে রাখতে পারলাম না। অবশেষে ওকে জানালাম আলিসার প্রতি আমার ভালবাসা—সে আগেই তা জানতো। গত বছর মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, আর তারই ফলে একটু বা গর্ব এসেছিল, মুরুব্বিয়ানা দেখা দিয়েছিল। আমি তাতে ক্ষুব্ধ হইনি। আমি যে ব্যাপারটার একটা সুরাহা করে ফেলিনি, এইজন্যে ও হাসলো। 'সুরাহা' কথাটা ওই ব্যবহার করলে। তারপরে স্বতঃসিদ্ধ এই সত্য এনে হাজির করলে, মেয়েদের কখনও এ-সব ব্যাপারে সময় দিতে নেই। ওকে বলতে দিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, ওর এমন চমৎকার যুক্তি এলিসা আর আমার দু-জনের ক্ষেত্রেই অচল। ও যে আমাদের বোঝেনি এ তারই প্রমাণ।

পৌঁছিবার পরের দিনই চিঠি পেলাম—

প্রিয় জেরোম আমার,

তোমার কথা বহু ভেবে দেখলাম (আমার কথা। আমাদের বাগদানের কথা বলার একি ধরন ওর!) আমার মনে হয়, তোমার বাগদত্তা হবার পক্ষে আমার বয়েসটা বেশ বেশী। তুমি হয়তো এখন এ-কথা ভাবছ না, এখন অন্য কোন মেয়ের সম্বন্ধে ভাবনার তোমার সুযোগ নেই বলেই ভাবছ না। কিন্তু আমি তো ভাবছি, এরজন্যে পরে আমাকে কত সইতে হবে। তোমাকে আত্মসমর্পণ করে, আমি হয়তো দেখতে পাব, তুমি আর আমাকে তেমন করে আদর কর না। এই চিঠি পড়ে তুমি হয়তো রেগে উঠবে; আমি তোমার প্রতিবাদ যেন শুনতে পাচ্ছি। তোমার ভালবাসায় তো আমার সন্দেহমাত্র নেই—আমি শুধু বলি, একটু অপেক্ষা কর, জীবনকে এর চেয়ে ভালো করে চেনো, জানো।

দোহাই তোমার, শুধু এইটুকু বুঝতে চেষ্টা কোরো, তোমার কথাই আমি বলছি। আমার কথা যদি শুনতে চাও, আমি তো নিশ্চিত যে, তোমাকে ভালবাসব না, এমন দিন কখনো আসবে না।

—আলিসা।

একে অপরকে ভালবাসব না! এ সম্পর্কে কি কোন প্রশ্ন ওঠে?

দুঃখিত হলাম, বিস্মিত হলাম তার চেয়ে বেশী। কিন্তু বড়ই বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে গেলাম আবেলকে চিঠিখানা দেখাতে।

চিঠি পড়ে সে মাথা নাড়লে, ঠোঁট কোঁচকালে, তারপরে বললে, কি করবে এখন? আমি হতাশার অঙ্গভঙ্গী করলাম। ও বললে, যাই হোক তুমি নিশ্চয়ই এ চিঠির উত্তর দেবে না! মেয়েদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলেই হয়েছে! শোন, আমার কথা শোন, লা-হাভারে যদি শনিবার রাত্রে গিয়ে হাজির হই, তাহলে রোববার সকালটা ফোঁগেসমিরে কাটানো যাবে, তারপরে সোমবার সকালে ক্লাস শুরু হবার আগেই এখানে ফিরে আসতে পারব। পন্টনে ঢুকে আর তোমাদের বাড়ির কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। ওই

ছুতোই যথেষ্ট, ওতেই কাজ হবে। আলিসা যদি বুঝতে পারে, এ একটা ভানমাত্র, তাহলে তো ভালই হয়। আমি জুলিয়েতের ভার নেব'খন, তুমি ওর বোনের সঙ্গে তখন বাতচিত্ কোরো। বোকা-বনে যেওনা! সত্যি কথা বলতে গেলে, তোমার এ গল্পটায় এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমরা যে আসছি এ-কথা ওদের জানাবে না। তোমার ঐ 'তুতো বোনটিকে হঠাৎ হানা দিয়ে হক্‌চকিয়ে দিতে হবে যাতে ও নিজেকে সশস্ত্র করার সময় না পায়।

বাগানের ফটকের দরজা যখন ঠেলছিলাম, আমার বুকে তখন দ্রুত স্পন্দন দেখা দিয়েছে। জুলিয়েৎ তখুনি আমাদের দেখে ছুটে এল। আলিসা তখন পোষাকের ঘরে, তাড়াতাড়ি করে সে ছুটে এল না। মামা আর মিস্ আসবার্টনের সঙ্গে আলাপ করছিলাম, অবশেষে ও এল বসবার ঘরে। আমাদের এই অতর্কিত আগমনে ও যদিবা চমকে গিয়ে থাকে, ওর ব্যবহারে তার চিহ্নমাত্র দেখা গেলনা। আবেল যা বলেছিল, মনে পড়লো, ও যে আসতে দেরী করেছে তার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় তো আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা। জুলিয়েতের অমিত-উৎসাহে তো ওর গাম্ভীর্য আরো নিস্পৃহতায় শীতল মনে হতে লাগলো। মনে হোল, আমার আসায় ওর আছে অসম্মতি ; অন্তত ভাবভঙ্গীতে সেই অসম্মতি জ্ঞাপনের প্রচেষ্টা। কল্পনা করতেও তখন সাহস পেলাম না যে, ওই অসম্মতির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক উৎসাহ প্রোজ্জ্বল মনোভাব। আমাদের থেকে দূরে, এক কোণে জানালার ধারে গিয়ে ও বসে পড়লো। একটা সূচীকাজ নিয়েই ও তখন যেন ব্যস্ত, তারই সেলাইয়ের ফোঁড়গুলি ও গুণছে। বরাত ভাল, আবেলই কথা বললে! আমি তো তখন টু শব্দটি উচ্চারণেও অক্ষম। ও যদি ওর এক বছরের পল্টনি-জীবন আর ভ্রমণ বৃত্তান্ত না ফেঁদে বসতো এই

সাক্ষাৎকারের বিষণ্ণতারই সূচনা হোত। মামাও যেন তখন অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছেন।

দুপুরের ভোজনের পরে জুলিয়েৎ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। সে আমাকে বাগানে নিয়ে এল।

আমরা তখন একা, সে বললে, কি মনে হয় তোমার ? আমিও একটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছি ! ফেলিসি পিসি বাবাকে কাল লিখে জানিয়েছেন যে নিমেসের কি আঙুর-বাগিচার মালিকের কাছ থেকে একটা প্রস্তাব এসেছে। উনি তো বলেন, সবদিক থেকেই মানুষটি পছন্দসই। ও নাকি গত বছরের বসন্তে এক ভোজে আমাকে দেখেই ভালবেসে ফেলে।

এই লোকটি কি তোমার মনে কোন দাগ কেটে দিয়ে গেছে ? এই পাণিপ্রার্থীর প্রতি স্বভাবত এক বিরুদ্ধতাই অনুভব করলাম।

হাঁ, ওকে আমার মনে আছে। আমুদে ডন কুইকসোট (বিখ্যাত স্পেন লেখক সারভান্তিসের বিখ্যাত চরিত্র) তেমন মার্জিত নয়—বড় কুৎসিত—অতিমাত্রায় অশ্লীল—কেমন হাসি পায়। ফেলিসি পিসি তো মুখ তুলে কথাই বলতে পারছিলেন না ওর সামনে।

ও কি সুযোগ পেয়েছিল ? একটু ঠাণ্ডা করেই বললাম।

জেরোম ! তুমি যেন কি ? কি করে বললে ও কথা ? লোকটা ব্যবসায়ী !···ওকে দেখলে আর ও-কথা বলতে না।

মামা কি জবাব দিয়েছেন ?

আমার যে জবাব, তাঁরও সেই জবাব। আমার এখনো বিয়ের বয়স হয়নি। কিন্তু কি বরাত বল তো, সে হেসে বললে, পিসি ও-কথা আগেই ভেবে রেখেছিলেন। পুনশ্চতে তিনি লিখেছেন যে মসিঁয়ে এ-দুয়ার তিসিয়ের অপেক্ষা করতে রাজি আছেন—লোকটার ঐ নাম। তিনি যে এ-কথা বলেছেন, তার মানে 'জাতে' উঠতে চান। ব্যাপারটা অতি অসম্ভব, কিন্তু আমি

কি করবো বলতো? ও যে কুৎসিত সে-কথা তো আর বলা যায় না।

না, তা যায় না বটে! কিন্তু এ-কথা তো বলতে পারবে, একজন আঙুর-বাগিচার মালিককে তুমি বিয়ে করবে না।

সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে।

ও যুক্তি পিসির মগজে ঢুকবে না। থাকগে, এস এবার অন্য কথা পাড়ি। আলিসা তোমাকে চিঠি লিখেছে?

বাচাল হয়ে উঠেছিল সে, মনে হোল যেন বড় চঞ্চল, অস্থির। আমি ওর হাতে আলিসার চিঠিখানা দিলাম। ও পড়ে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো—ঘন রক্তরাগ দেখা দিল। ও যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে ওর স্বরে যেন রাগের আমেজ পেলাম!

তাহলে তুমি এখন কি করবে?

জবাব দিলাম, জানিনা। এখানে এসে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে চিঠি লেখা সহজ ছিল। এসে পড়ে নিজেকে দুষছি। ও কি চায়, কিছু বুঝতে পেরেছ?

ও তোমাকে মুক্তি দিতে চায়।

মুক্তি! মুক্তি কে চায়? ও কেন এমনধারা লিখলে বলতো?

সে জবাব দিলে, জানিনা। এমন সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, কিছু না বুঝেও আমার মনে হোল, জুলিয়েৎ ব্যাপারটার কিছু কিছু জানে। তারপরে আমরা আবার হঠাৎ ফিরে চললাম। পথের একটা বাঁকে এসে দাঁড়ালাম। ও বললে, এখন আমি যাই। আমার সঙ্গে কথা বলতে তো তুমি আসনি। অনেকক্ষণ দু-জনে একসঙ্গে রয়েছি।

ও বাড়ির ভিতরে ছুটে চলে গেল। মুহূর্ত পরে পিয়ানো বেজে উঠলো।

বসবার ঘরে যখন ফিরে এলাম, তখন দেখলাম, ও আবেলের

সঙ্গে গল্প করছে। সে এসে জুটেছে ওখানে। কথা বলছে আর বাজাচ্ছে, কেমন যেন তাচ্ছিল্যভরেই বাজাচ্ছে, সুর-বিস্তার এখনো অস্পষ্ট—সুষ্ঠুরূপ নেয়নি। ওদের কাছ থেকে চলে এসে বাগানে এলাম। ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম আলিসার সন্ধানে।

বাগানের একেবারে শেষদিকে ওকে পেলাম। একটা নীচু দেয়ালের কাছ থেকে প্রথম ফোটা চন্দ্রমল্লী তুলছিল। বাগানের ফুলের গন্ধ মিশে যাচ্ছিল বীচ-গাছের ঝরা পাতার সঙ্গে—পরিবেশ এখন হেমন্তময়। সূর্য তো শুধু উষ্ণ করে তোলে লতাকুঞ্জ, তার বেশী তো তার শক্তি নেই। ওর মুখখানা আবেলের বিদেশ থেকে আনা ওলন্দাজী টুপীর গভীরে লুকিয়ে আছে, ফ্রেমে-আঁটা হয়ে আছে। কাছে এলাম, ও ফিরে তাকালো না, কিন্তু ওর দেহের ঈষৎ কম্পনে টের পেলাম, আমার পদশব্দ ও শুনেছে, ও তো তাকে চেপে রাখতে পারছে না। ওর ভৎর্সনা আর কঠোরতার বিরুদ্ধে নিজেকে সুরক্ষিত করে নিতে চেষ্টা করতাম, মনে হোল, ওর দৃষ্টি থেকেই তা নিক্ষিপ্ত হবে, আমার উপর আরোপ করবে, কিন্তু যখন কাছে এলাম, ভয়ে ভয়ে গতি কমে এল। আর ও, যদিও তখনো ফিরে তাকায়নি, অভিমানী শিশুর মতোই মাথা নুয়ে পড়লো, পেছন দিয়ে ওর ফুল-ভরা হাতখানা বাড়িয়ে দিল, আমাকে বুঝি কাছে আসতেই ইসারা করলে। আর এদিকে, আমি ওর ইসারা বুঝে ছল করে থেমে পড়লাম। অবশেষে ও ফিরে তাকালো, আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। মুখ ওর তোলা, দেখলাম, সে-মুখে হাসি-ভরা। হঠাৎ ওর দীপ্ত দৃষ্টিতে সব-কিছু সরল, সহজ হয়ে গেল, কিছুমাত্র দ্বিধা না করে, স্বরে পরিবর্তন না এনে বললাম,

তোমার চিঠিই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

আমিও তাই ভেবেছি, ও বললে, তারপর ওর ভৎ‍র্সনার তীব্রতা স্বরের স্ফীতিতে কোমল করে এনে বললে, ওতেই তো আমি বিরক্ত হয়েছি। আমি যা বলেছি, তোমার ভাল লাগল না কেন? ব্যাপারটা তো সহজই ছিল (বাস্তবিক বিষণ্ণতা আর জটিলতা তো তখন আমার কল্পনাবিলাস মাত্র, সে তো তখন আমার মনেই আছে)। আমরা তো সুখী ছিলাম, তোমাকে তো বলেছি, আমরা সুখী—সুখী ছিলাম। তুমি যখন তা বদলে দিতে বললে আমি রাজি হলাম না। এতে অবাক হবার কি আছে?

সত্যিই আমি ওর সঙ্গ পেয়ে খুশি হলাম, সুখী হলাম—এ যে পরিপূর্ণ সুখ। আমার মনের তখন একমাত্র কামনা, ওর সঙ্গে অমিল আমার যেন না হয়; ওর কাছ থেকে হাসি ছাড়া তো আর কিছু চাইনা, চাই ওর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সূর্যদীপ্ত ফুলের পাড়টানা এই পথে বেড়াতে।

গম্ভীর স্বরেই বললাম, অন্য সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বর্তমানের সুখে আত্মসমর্পণ করে দিলাম: তোমার যদি তাই ইচ্ছা, আমরা বাগদান করবো না; তোমার চিঠি পেয়ে মনে হয়েছিল আমি একদিন সুখী ছিলাম, আজ সেই সুখ শেষ হতে বসেছে। দাও, দাও, আমাকে সেই অতীতের সুখ ফিরিয়ে দাও। আমি তো তাছাড়া বাঁচবো না। আমি তোমাকে এতখানি ভালবাসি যে, সমস্ত জীবন ধরে তোমার জন্যে বসে থাকবো। কিন্তু আলিসা, তুমি যে আমাকে আর ভালবাসবে না, আমার ভালবাসায় যে তোমার সংশয় আসবে, সে চিন্তাও তো আমার পক্ষে অসহ্য।

হায় জেরোম, আমিও তো সে-ভালবাসায় সন্দেহ করতে পারব না!

ও যখন বলছিল, ওর স্বর ছিল শান্ত, আবার বিষণ্ণ, কিন্তু যে-হাসি

ওকে দীপ্ত করে তুলেছিল, সে তো ছিল শান্ত-সুন্দর। আমি তো আমার ভীরুতা আর কাকুতি-মিনতির জন্যে লজ্জিতই হলাম। তখন মনে হয়েছিল, ঐ থেকেই বুঝি বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে ওর স্বরে। কিন্তু পরিবর্তিত হোল না আমার স্বভাব, বলতে লাগলাম আমার পরিকল্পনা আর নতুন জীবনের কথা—তার থেকে তো আমি তখন অনেকখানি লাভ করতে চাই। তখনকার নর্মাল ইস্কুল এখনকার মতো ছিল না। তার কঠোর শৃঙ্খলা ছিল অলস ছাত্রদের পক্ষে বিরক্তিকর, আর যারা পড়তে চায়, তাদের তো সাহায্যই করতো। ভেবে খুশি হলাম, এই সন্ন্যাস জীবন আমাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। পৃথিবী তো আমার মনকে খুব কমই টানে! আলিসা যে আমার জন্যেই এই পৃথিবীকে ডরায় একথা জানতে পেরে আরো বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম।

মিস আসবার্টন পারীতে মার সঙ্গে যে বাসাবাড়িতে থাকতেন, সেটি ভাড়া করেই রাখলেন। আবেল আর আমি তখন পারীতে একরকম কাউকে চিনিই না, তাই প্রতি রোববারই ওঁর ওখানে কাটাবো বলে ঠিক করলাম। প্রতি রোববার আমার জীবনের খুটিনাটি কথা জানিয়ে আলিসাকে চিঠি লিখতাম।

যাকগে ওকথা, আমরা বসেছিলাম খোলা মেলা বাগানের প্রান্ত সীমায়। শসা গাছ সেখানে লতিয়ে দিয়েছে তার ডালপালা, তার শেষ ফলটি তখন তোলা হয়ে গেছে। আলিসা শুনছিল আমার কথা, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিল। ওর মনের কোমলতা যে মিনতিতে এমন মধুর, ওর ভালবাসা যে এমন উদগ্র—এ তো আগে টের পাইনি। ভয়, উদ্বেগ, ভাবাবেগের ক্ষণিক আলোড়ন ওর হাসিতে তো উবে যায়, ওর আনন্দময় সঙ্গসুখে মিলিয়ে যায়, যেমন মিলিয়ে যায় কুয়াশা নিতল নীল আকাশে।

এবার জুলিয়েৎ আর আবেল আমাদের দলে এসে ভিড়লো।

বটগাছের ছায়ায় বেঞ্চে বসে কাটিয়ে দিলাম দিন। জোরে জোরে পড়তে লাগলাম সুইনবার্ণের 'কাল জয়ী', এক এক জনে এক একটা কবিতা পড়ছিলাম। সান্ধ্য হয়ে এল। যখন আমাদের যাবার সময় হোল, আলিসা আমাকে চুমু খেয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু তখনো লীলাচ্ছলে বড় বোনের ভূমিকাই সে অভিনয় করছে। এই ভূমিকাটি তখন তার প্রিয়, আমার নির্বুদ্ধিতায়ই বুঝি ও অমন অভিনয় করলে।

ও বললে, এস, আমাকে কথা দাও, তুমি আর ভবিষ্যতে এমন ভাবপ্রবণ হবে না।

আমরা একা হতেই আবেল জিজ্ঞেস করলে, কি বাগদান হয়ে গেল?

জবাব দিলাম, এখন আর ও প্রশ্নই ওঠেই না। আমার স্বর তখন এমন যে, অন্য প্রশ্ন ওঠার আর সুযোগ রইল না। আবার বললাম, সেই তো ভাল। আজ রাতে আমি যেমন সুখী, এমন তো আর কোনদিন হইনি।

সে চেঁচিয়ে উঠলো, আমিও না! আমার গলা হঠাৎ জড়িয়ে ধরলো, তোমাকে একটা অবাক-করা খবর দিচ্ছি, একেবারে তাজ্জব খবর! জেরোম, আমি জুলিয়েতের প্রেমে পাগল। গত বছরই সন্দেহটা হয়েছিল; কিন্তু জীবনে খানিকটা অভিজ্ঞতা এর মধ্যে হয়ে গেছে, তাই ওর সঙ্গে দেখা না হওয়া অবধি তোমাকে কিছু বলিনি। এখন তো আমি একেবারে কাবু। চির জীবনের মতো আমি ধরা পড়লাম!

আমি ত জুলিয়েৎকে পূজা করি!

আগেও বহুদিন ভেবেছি, তোমার উপরে আমার টানটা যেন ঠিক শ্যালকের উপর ভগ্নিপতির টানের মতো।

তারপরে হাসি আর তামাসা চললো, ও আমাকে বার বার জড়িয়ে ধরলো। যে গাড়ীতে আমরা পারী যাচ্ছিলাম তারই

কামরায় গদির উপরে ছেলেমানুষের মতো সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ওর ঘোষণা শুনে আমি তো একেবারে হতভম্ব। আর সাহিত্যিক ভণিতার একটু ছোঁয়া লাগায় আমাকে তো আরো হকচকিয়ে দিলে! কিন্তু অমন আবেগ, অমন আনন্দ বিহ্বলতার সুমুখে কি করে নিজেকে সামলে রাখবো?

ওর উত্তেজনার বিস্ফোরণের ফাঁকে কোন রকমে জিজ্ঞেস করলাম, কি—ওর কাছে প্রস্তাব করলে নাকি?

ও চেঁচিয়ে উঠলো, না, না, নিশ্চয়ই না! ওভাবে কাহিনীর মধু টুকু এড়িয়ে যেতে চাই না।

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দুষবে না? তুমি নিজে তো একেবারে কুঁড়ের বাদশা!

একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলাম, তোমার কি মনে হয়, ও—

আমাকে আবার দেখে ও কেমন বিব্রত হয়ে পড়লো দেখনি? যতক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম—সে-কি উত্তেজনা, কি লজ্জা, আর কি মুখরতা! না! তুমি দেখছি কিছুই লক্ষ্য করোনি! তুমি তো তখন আলিসাকে নিয়েই বিভোর। উ, সেকি জেরা শুরু করলে! আমার কথা যেন গিলে খায় আর কি! গতবারের চেয়ে এবার দেখলাম ওর বুদ্ধি বেড়েছে। জানি না, তুমি কি করে জানলে যে, ও পড়াশুনো পছন্দ করে না; তুমি তো ভাব আলিসাই ত একমাত্র মেয়ে যে সব কিছুই করতে পারে! ওহে বৎস শোন, ও যে কত জানে, শুনলে তাক্ লেগে যাবে। রাতের খাবার আগে আমরা কি মজায় কাটিয়েছি আঁচ করতে পার? আমরা দান্তের ক্যানজান থেকে আবৃত্তি করছিলাম! এক একজন আবৃত্তি করছিলাম এক—এক ছত্র, আমি যখন ভুল করছিলাম, ও শুধরে দিচ্ছিল। তুমি তো ওটা জান—ঐ যে যার শুরুতে আছে—

আমার এ প্রেম···

তুমি তো বলনি, ও লাতিন ভাষা জানে।

অবাক হয়েই বললাম, আমি নিজেই তো জানি না।

কিন্তু ক্যানজান যখন আবৃত্তি শুরু করলাম, ও আমাকে বললে, তুমিই নাকি ঐ কবিতাটা ওকে শুনিয়েছ ?

ওর বোনকে যখন পড়ে শোনাচ্ছিলাম তখন ও বসেছিল আমাদের সঙ্গে। হয়তো শুনে থাকবে। ও তো সেলাই নিয়েই ব্যস্ত ছিল—সব সময়েই তো তাই থাকে। কিন্তু ওযে বুঝতে পারবে একথা আমি তো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তাই নাকি ? তুমি আর আলিসা দেখছি নিজেদের গর্বেই গেলে ! নিজেদের ভালবাসায় এমন বিভোর যে, ওর আত্মা আর বুদ্ধির যে এমন চমৎকার বিকাশ হ'চ্ছে সেদিকে একবার নজর দেয়ারও তোমাদের সময় নেই ! নিজের গর্ব করতে চাইনে, তবে সময় মতো আমি এসে আসরে হাজির হয়েছি বলেই মনে হয়। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, না, না, তোমার উপর আমি চটিনি, কথা দিতে হবে, আলিসাকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। নিজের ব্যাপারে আমি নিজে বুঝবো। জুলিয়েৎ জালে যে ধরা পড়েছে এটা একেবারে নিশ্চিত ! ও এত তাড়াতাড়িই ধরা পড়লো যে সামনের ছুটিটা অবধি ওকে আর ছেড়ে থাকবার তর সইছে না। কিন্তু ওর কাছে এর ভিতরে চিঠি লিখবো না বলেই ঠিক করেছি। তবে বড়দিনের ছুটিটা কাটাতে লা হাভার-এই আসবো, আর তখন—

তখন কি হবে ?

আলিসা আমাদের বাগদানের কথা শুনতে পাবে। আমি বেশ চালাকি করেই কাজটা হাঁসিল করবো দেখো। তারপরে কি হবে ভাবতো ? আমাদের এই উদাহরণের জোরেই তোমাকে আলিসার সম্মতি আদায় করে দেব। নিজে তো কিছুই পারবে না ! আমরা

দুজনে ওকে এমন পেড়াপীড়ি শুরু করবো যে, তোমাদের আগে আমাদের বিয়ে হতে পারে না···

এমন কি বক্ বক্ করেই ও চললো, ওর কথার অফুরন্ত স্রোতে আমাকে ডুবিয়ে দিলে। পারীতে গাড়ি এসে পৌঁছুলেও তা থামলো না, এমনকি নর্মাল ইস্কুলে গিয়েও না। আমরা স্টেশন থেকে স্কুল অবধি হেঁটে গেলাম। তখন যথেষ্ট রাত রয়েছে, তবু ও আমার ঘরে যাবে বলে পেড়াপীড়ি করতে লাগলো, তারপরে সেখানে গিয়ে ভোর অবধি আমরা কথা বলেই কাটিয়ে দিলাম।

আবেলের এই উৎসাহ বর্তমান আর ভবিষ্যতের পরিধি সংকীর্ণ করে নিয়ে এল। ও তখন আমাদের ডবল বিয়ের ছবি দেখছে, আর বর্ণনা করছে। প্রতিজনের বিস্ময় আর আনন্দের কল্পনা করছে, ছবি আঁকছে ; আমাদের এই কাহিনী ওকে তখন পেয়ে বসেছে, আমাদের বন্ধুত্ব, আমাদের প্রেমের ব্যাপারে ওর ভূমিকা—এই নিয়েই চলছে কথার মালা গাঁথা।

এই রম্য উত্তেজনাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা তো দূরের কথা, আমি নিজেও যেন ওতে ঢাকা পড়ে গেলাম, এই অলীক নির্দেশময় প্রলোভনের কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম। ধন্য এ ভালবাসা ! সাহস আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায়ও তখন আমি স্ফীত। মনে মনে ভাবছিলাম, নর্মাল ইস্কুল ছাড়বার আগেই আমাদের ডবল বিবাহ হয়ে যাবে (পাদ্রী ভ'ত্তিয়ে দেবেন সে বিবাহ) আমরা বিবাহের পর চারজনে যাত্রা করবো মধুচন্দ্রিকা যাপনে। তারপরে আমরা রচনা করবো স্মরণীয় গ্রন্থাবলী, আর তার সহযোগিনী হবেন আমাদেরই স্ত্রীরা। আবেলের ইস্কুল মাস্টারী পেশার উপর আকর্ষণ ছিল না সে মনে করতো লেখক হবার জন্যেই তার জন্ম। টাকাকড়ির তার যথেষ্টই দরকার। তাই ভাবতো, সে কয়েকখানা সফল নাটক লিখে শীঘ্রই ধনী হয়ে উঠবে। আর আমার কথা হোল, আমি জ্ঞানের জন্যই

জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট—ওর থেকে কি লাভ হবে না হবে ভাবি না। আমার জীবনের খসড়া হোল, আমি ধর্মসম্বন্ধীয় দর্শন পড়ব, তার ইতিহাস লিখবো—কিন্তু সেদিনের সেই কামনার স্মৃতি মন্থন করে লাভ কি!

আমরা পরদিন থেকে কাজে ডুবে গেলাম।

চার

বড়দিনের ছুটি পর্যন্ত সময়টা ছিল বড় কম, আলিসার সঙ্গে শেষ বারের আলাপে যে বিশ্বাস আমার মনে বেড়ে উঠেছিল, মুহূর্তের জন্যও তা তো টললো না। যে মনটি স্থির করেছিলাম তেমনি প্রতি রোববারে চিঠি যেতে লাগলো ; সপ্তাহের বাকি কটা দিন সহপাঠীদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতাম ; এক আবেল ছাড়া আর কারো কাছে ঘন ঘন যেতাম না।—আলিসার ভাবনার সঙ্গেই তখন আমার সহবাস চলছে। আমার প্রিয় বইগুলি কণ্টকিত করে তুলেছি টীকায়—ওর চোখে পড়বে বলেই আমার এই প্রয়াস ; নিজের চেয়েও আনন্দ পাবে বলেই করেছি। কিন্তু ওর চিঠি তখন আমাকে অস্থির করে তুলতো—অস্বস্তি ভোগ করতাম। বেশ নিয়মিতই ও উত্তর দিত, আমার সঙ্গে ওর তাল রেখে চলায় যেন মনে হোত, আমার কাজে উৎসাহ দেবার উদ্বেগই বেশী, স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছা যেন সেখানে কম। এও মনে হোত, আমার নিজের দিক থেকে এই মতামতের প্রকাশ, আলোচনা বা সমালোচনা আমার মনের অভিব্যক্তি হলেও সে তো নিজেকে আড়াল করেই রাখছে। কখনো বা ভাবতে বসতাম, ও একে খেলা বলেই ধরে নিয়েছে, আনন্দ পাচ্ছে। তাতে কি যায় আসে! আমি তো তখন দৃঢ়মনা, অভিযোগ তো আমি করবো না। তাই উদ্বেগের রেশটুকুও চিঠিতে যাতে ফুটে না ওঠে সে বিষয়ে আমি ছিলাম সজাগ।

ডিসেম্বরের শেষে আমি আর আবেল লা-হাভারে রওনা হলাম। প্লাঁতিয়ে মাসির ওখানে। আমার থাকার কথা ছিল। যখন এসে পৌঁছলাম, তিনি বাড়ি ছিলেন না। নিজের কামরায় গিয়ে একটু সুস্থ হয়ে বসতে না বসতেই পরিচারক এসে খবর দিলে তিনি বসবার ঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আমার শরীর, পড়াশুনো, আমার পরিবেশের তত্ব নিয়েই তিনি আর ভূমিকা না করে সস্নেহ কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে বসলেন,

বাছা, বললে না তো ফোঁগেসমিরে এসে খুশি হলে কিনা ? ও ব্যাপারটায় কি কিছুটা এগুতে পারলে ?

যে অনুভূতির প্রকাশে সবচেয়ে পবিত্র আর মধুর শব্দাবলীও রুক্ষ বলে মনে হয়, এমন করে বলায় তা যতই শ্রুতিতে পীড়া দিক, তবু মাসির এই সরলতা আর বুদ্ধির অভাব সয়ে গেলাম। কিন্তু ওঁর স্বর ছিল এত স্বাভাবিক, আর সহৃদয়তা মাখানো যে রাগ করা তো মূর্খতাই হোত। তবুও, একটু আপত্তি না করে পারলাম না।

গত বসন্তে তুমিই কি বলনি, যে এখনো বাগদানের সময় হয় নি ?

হাঁ তা তো জানি।...সবাই সে কথা শুরুতে বলবে। তিনি আবার বলতে লাগলেন। নিজের দুহাতে সবেগে চেপে ধরলেন আমার হাত। তা ছাড়া তোমার পড়াশুনো, ফৌজে শিক্ষানবিশীতেও তো...কয়েক বছর যাবে। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে না। আবার, ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে দীর্ঘদিন বাগদান করে ঝুলিয়ে রাখা পছন্দ করিনে। তরুণী মেয়েদের পক্ষে সে তো অসহ্য, দেখতেও খারাপ লাগে.. তাই বাগদানটা জাহির করে লাভ নেই।...মানুষকে শুধু জানিয়ে দিলেই হোল—আর খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হতে হবে না গো ; তাছাড়া চিঠিপত্র লেখার দাবিটাও স্বীকার করে নিলেই হোল, ঐ সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দাবি। আবার অন্য কেউ যদি

এগিয়ে আসে—আর তা তো হচ্ছেই বাছা, তিনি সব জান্তা হাসি হেসে বললেন, তখন একটা ইঙ্গিত করাও চলে, এখন আর লাভ নেই গো লাভ নেই। তুমি তো জানো, জুলিয়েতের একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। এবার শীতে ও অনেক লোকের নজরেই পড়েছিল। ও জবাব দিয়েছিল, ওর এখনো বয়েস ঢের কম, কিন্তু ছেলেটি তো অপেক্ষা করার কথা বললে···অবশ্য, সে ঠিক ছেলেটি আর নেই···তবে সম্বন্ধটি ভাল, লোকটিও নির্ভরযোগ্য। তুমি কালই তাকে দেখতে পাবে। বড়দিনের উৎসবে ও আসবে। ওকে কেমন লাগলো আমাকে জানাবে।

আবেলের নাম সোজাসুজি না করেই বললাম, কিন্তু মাসি, আমার ভয় হচ্ছে ভালবাসার শ্রম তোমার পণ্ডই হোল, জুলিয়েতের অন্য আর একজনের দিকে মন পড়েছে।

ফেলিসি মাসি এক পাশে মাথা হেলিয়ে দিয়ে অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তুমি তো অবাক করে দিলে বাছা? ও নিজে তো আমাকে কিছু বলেনি?

আমি ঠোঁট কামড়ে নিরস্ত করলাম নিজেকে। আর কিছু বলতে চাই না। তিনি বলে চললেন, যাক—শীগগিরই জানা যাবে। ওর শরীরটাও আজকাল ভাল যাচ্ছেনা। থাকগে, এখন ওর কথা তো আমরা বলছিনা। আলিসাও বড় সুন্দর হয়ে উঠেছে। বল তো বাছা, তুমি কি ওকে জানালে? সমস্ত মন ঐ অসঙ্গত জানালে কথাটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেও এই সোজাসুজি প্রশ্নের আমি মিথ্যে জবাব দিতে পারলাম না। বিব্রত হয়ে বললাম, হ্যাঁ। মনে হোল মুখখানা যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

ওকি বললে?

মাথা নিচু করে রইলাম; জবাব দেবার ইচ্ছে ছিল না। তবু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে জবাব দিলাম, ও বাগদত্ত হতে চায় না।

ঠিকই বলেছে, মাসি বললেন, ঢের সময় আছে। ভগবান জানেন……

থাক, মাসি, ওকথা এখন থাক! যথেষ্ট হয়েছে, ওঁকে থামাবার বৃথা চেষ্টাই করলাম।

আমি কিন্তু অবাক হইনি; তোমার বোনের তোমার চেয়ে কাণ্ডজ্ঞান বেশী বলেই আমার মনে হয়েছে……

এইবার কি যে আমার হোল জানিনা; আমার স্নায়ুগুলি এই জেরায় নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, তাই মনে হোল, বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। ছেলেমানুষের মতো আমার সদয়হৃদয়া মাসিমার কোলে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলাম,

মাসি না, না! তুমি বুঝতে পারছ না! ও আমাকে অপেক্ষা করতে বলেনি।

কি—তোমাকে ফিরিয়ে দিলে? নিজের হাতের উপর আমার মাথা তুলে নিয়ে বললেন।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লাম, না, না, ঠিক তা নয়,

তোমার কি মনে হয়, ও আর তোমাকে ভালবাসে না?

না, সে ভয় আমার নেই।

বাছা, যদি বলতে চাও তো একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল!

ভাবাবেগের অতি-প্রকাশে আমি তখন লজ্জিত, বিরক্ত। আমার এই সঙ্কোচের কারণ মাসিমা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন নি; কিন্তু আলিসার প্রত্যাখ্যানের আড়ালে যদি বিশেষ কোনো অভিসন্ধি থেকে থাকে, তাহলে তো ফেলিসি মাসি আস্তে আস্তে তাকে প্রশ্ন করে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন। তিনি নিজেও এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছিলেন।

বললেন, শোন, আলিসা কাল বড়দিনের গাছ সাজাতে আমাকে সাহায্য করতে আসবে; শীগ্‌গীরই তলিয়ে বোঝা যাবে ব্যাপারটা;

দুপুরে খাবার সময়ই তোমাকে জানিয়ে দিতে পারব। তুমি ঠিক জেন বাছা, ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি।

বুকোলেঁাদের বাড়িতে রাতে খেতে এলাম। সত্যই গত কয়েক-দিন ধরে জুলিয়েৎ অসুস্থ; কেমন যেন বদলেই গেছে; চোখে ওর ভ্রূকুটি—কেমন যেন কঠোর অভিব্যক্তি। ওর বোনের চেয়ে ওকে যেন আরো বেশি আলাদা বলে মনে হোল। সেদিন রাতে ওদের কাউকেই একা পেলাম না; আর তা চাইও নি। মামাকে ক্লান্ত দেখে খাবার পরেই চলে এলাম।

বড়দিনের গাছ প্লাতিয়েঁ মাসি ফি-বছরই সাজান, আর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে-মেয়ের দলও জোটে। ভিতরের হল-ঘরে গাছটি বসান হয়, এইখানেই উপরে যাবার সিঁড়ি, আবার এখান থেকেই বসবার ঘর আর সামনের হল-ঘরে যাওয়া যায়। সারি সারি কাচের দরজা যেন উৎসবেরই আভাস দেয়—এইখানেই বসে উৎসবের আসর। গাছ-সাজানো সেবার তখনো শেষ হয় নি। উৎসবের সকালে মাসির কথামতো ডাল-পালায় আলো, মেঠাই, খেলনা নানারকম গয়না, ফল প্রভৃতি রকমারি জিনিস টাঙিয়ে দিতে সাহায্য করতে এল আলিসা—বেশ তাড়াতাড়িই এল। আমি ওকে সাহায্য করে বেশ আনন্দই পেতাম, কিন্তু ফেলিসি-মাসিকে ওর সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ দিতে হোল! ওর সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। সকাল কেটে গেল, উদ্বেগে-ভরা প্রহরগুলির অতিবাহিত হোল বৃথা ব্যয়ে।

প্রথমে গেলাম বুকোলোঁদের ওখানে। জুলিয়েতের সঙ্গে আমার তখন দেখা করা দরকার। শুনলাম, আবেল আমার আগেই এসে গেছে। ওদের আলাপের পরম মুহূর্তে বিঘ্ন না ঘটিয়ে তখুনি চলে এলাম। দুপুরের খাবার সময় অবধি জাহাজঘাটা আর পথে ঘোরাফেরা করে কেটে গেল।

মাসির সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, একেবারে হাঁদারাম! কিছু হয়নি, অথচ অমন মন-মরা হয়ে থাকা তো বাছা বরদাস্ত হয় না! কাল যা বলেছি, তার তো একটা কথারও কোনো মানে হয়না। তা আমি বাপু, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে যাইনি। মিস আসবার্টন আমাদের কাজে যোগান দিয়ে দিয়ে হেদিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর একা হতেই, সোজা আলিসাকে জিজ্ঞেস করলাম, গত গ্রীষ্মকালে ও তোমাকে ফিরিয়ে দিলে কেন। তোমার কি মনে হয় ও চটে গেল? এক লহমার জন্যে একটুও টললো না মেয়ে, শান্তভাবে জবাব দিলে, বোনের আগে ও বিয়ে করবে না। তুমি যদি খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে, ও ঐ জবাবই দিত; এই নিয়ে এত কাণ্ড! দেখ বাছা, খোলাখুলি কথার মার নেই। আহা, বেচারী আলিসা! ও ওর বাপের কথাও বলছিল; তাঁকে ও ছেড়ে যেতে চায় না, পারে না! বহুক্ষণ কথা হোল। আহা বাছার ভারি বুদ্ধি! ও বললে, এখনো ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না—ও তোমার যোগ্য কি না। ওর তো ভারি ভয়, ওর বয়েস বেশী, জুলিয়েতের মতো অমন ছোটটি হলেই নাকি তোমার সঙ্গে মানায়······

মাসি বলে চললেন, আমি আর কান দিলাম না। একটা কথাই তখন আমি জানি—আলিসা তার বোনের আগে নিজে বিয়ে করবে না। কিন্তু আবেল রয়েছে না? ওর যতই গর্ব থাকুক, ও ঠিকই বলেছে; ও ঠিক এক ঢিলে দুটো বিয়ে ঘটিয়ে দেবে।

এই সহজ-সরল প্রকাশে উত্তেজনায় ছেয়ে গেল দেহ-মন, মাসির কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। ওঁর কাছে আনন্দই প্রকাশ করলাম, আর উনি তো তা স্বাভাবিক বলেই মনে করলেন। বরং উনি আরো খুশি হয়ে উঠলেন। কিন্তু

দুপুরের খাবার পরেই কি-একটা ছুতো করে বিদেয় নিলাম। আবেলের খোঁজে ছুটলাম এবার।

ওকে যখন খোস্ খবর জানালাম, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, তোমাকে বলিনি? বন্ধু, আমি তোমাকে এ-কথা বলতে পারি যে, আজ সকালে জুলিয়েতের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর সব প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা তো আমরা এক রকম বলিই না। কিন্তু ওকে যেন কেমন ক্লান্ত মনে হোল। বড় অস্থির—আর বেশীদূর এগোতে সাহস হোল না, তাই চলে এলাম, কি জানি বেশিক্ষণ থাকলে যদি আরো অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু তুমি যা বললে, আর তো আমার দ্বিধা নেই! বন্ধু, টুপি আর লাঠিখানা তুলে নিলাম, আমি চললাম। আমার সঙ্গে বুকোলেঁদের বাড়ি অবধি তুমিও পেছু পেছু এস, কি জানি পথে যদি কোথাও উধাও হয়ে যাই! এখন আমি পাখীর চেয়েও হালকা! জুলিয়েৎ যখন শুনবে, শুধু ওরই জন্যে ওর বোন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—আর আমি যখন ঠিক সেই সময়েই প্রস্তাব করে বসবো—আহা বন্ধু—আমার বাবাকে আমি কল্পনায় বড়দিনের গাছের কাছে দেখতে পাচ্ছি, ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন আর আনন্দে চোখের জল ফেলছেন! দু-জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা এসে যখন তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসবে—তখন কি হবে বলতো! মিস আসবার্টন তো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বুঝি উড়ে উড়ে চলবেন; আর প্লাতিয়েঁ মাসি তো গলে যাবেন, আর ঐ আলোয় আলো-ভরা গাছ তো ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন করতে শুরু করবে, ধর্ম-শাস্ত্রের পাহাড়গুলির মতো হাততালি দিতেই বা বুঝি শুরু করবে।

সন্ধ্যের দিকে গাছে আলো জ্বালবার কথা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর ছেলেমেয়ের দলেরও তখন জমায়েৎ হবে।

কি করব ভেবে পেলাম না। উদ্বেগে আমি তখন অধীর। আবেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টীলার উপর দিয়ে চললাম, সময় এইভাবে কাটিয়ে দেওয়াই বুঝি ভাল—পথ হারিয়ে ফেললাম; এমন কৌশলেই সময়টা কাটিয়ে দিলাম যে, প্লাতিয়েঁ-মাসির ওখানে গিয়ে যখন হাজির হলাম তখন পূরোদমে চলছে উৎসব।

হলঘরে এসেই আলিসাকে দেখতে পেলাম। আমারই প্রতীক্ষায় যেন ছিল, অমনি আমার কাছে এল। ওর বডিসের অনাবৃত স্থান-টুকুতে ও পরেছে খুদে ক্রুশটি—আমার মার ঐ স্মৃতিটি ওকে দিয়েছিলাম। আগে তো কখনো ওটি ওকে ব্যবহার করতে দেখিনি। ওর দেহে যেন সে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য নেই, কেমন চুপসে গেছে; ওর মুখে দুঃখের নিবিড়তা। বুকে আঘাত বাজলো আমার। এক নিশ্বাসে শুধালে, এত দেরী হোল যে! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

পাহাড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম······কিন্তু তুমি দেখছি অসুস্থ ···আলিসা! কি হয়েছে?

এক মুহূর্ত আমার সুমুখে ও দাঁড়িয়ে রইল, যেন ও বোবা বনে গেছে হঠাৎ, ঠোঁট দুখানি কেঁপে কেঁপে উঠলো। এমন ভয় পেলাম যে, ওকে আর প্রশ্ন করতে সাহস হোল না। ও আমার গলার উপর হাত রাখলো, বুঝি বা আমার মুখখানা ওর কাছে টেনে আনতে চায়। বুঝলাম, ও কি যেন বলতে চায়, কিন্তু এমনি সময় এলেন ক'জন অতিথি। হতাশ হয়ে ও হাতখানা তুলে নিলে···

ও অস্ফুট-স্বরে বললে, বড় দেরী হয়ে গেল—না? আমার চোখে জল দেখতে পেয়ে আমার উৎসুক দৃষ্টির উত্তরে ও বললে—যেন অমন তুচ্ছ কৈফিয়তে আমি শান্ত হব—হতে পারব!

না, না!—ভয় পেওনা। মাথাটা ধরেছে, ছেলে-মেয়েরা যা গোলমাল করছে!······এখানে শেষে এসে বসলাম...এখন আবার ওখানে যেতে হবে।

ও হঠাৎ চলে গেল। কয়েকজন লোক এসে ঢুকলো, ওর সঙ্গ থেকে তারা আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ভাবলাম, ওর সঙ্গে বসার ঘরে দেখা হবে। ওকে ঘরের এক প্রান্তে দেখলাম। এক পাল ছেলে-মেয়ের ভিড় ওকে ঘিরে আছে, ওদের খেলার ও হয়েছে সর্দার। নির্দেশ দিচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের তুজনের ভিতরে রয়েছে ব্যবধান—রয়েছে বহু পরিচিত মুখ। ওদের পাশ কাটিয়ে তো যেতে পারব না—থামবার ঝুঁকি নিতেই হবে। ভদ্রতায় এখন আমি অপারগ, আলাপে অক্ষম; যদি দেয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে চলে যাই কেমন হয়···সেই চেষ্টাই করলাম।

যেমনি বাগানে যাবার কাচের দরজাটার সামনে এসেছি, হঠাৎ কে আমার হাত চেপে ধরলো। জুলিয়েৎ পর্দার ভাঁজের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

ও তাড়াতাড়ি বললে, সবুজ-ঘরে (যেখানে চারাগুলো জন্মান হয়) চল, তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমি চলে যাও, আমি এখুনি আসছি। এক মুহূর্তের জন্ম দরজা আধখানা খুলে ও নিঃশব্দে বাগানে চলে এল।

কি হোল? আবেলের সঙ্গে দেখা হলে ভাল হোত। ও কি বলেছে? কি করেছে? হল-ঘরে ফিরে এসে আমি সবুজ-ঘরের দিকেই চললাম। সেখানে জুলিয়েৎ আছে আমারই প্রতীক্ষায়।

ওর মুখখানা আরক্ত, কুঞ্চিত ভ্রূতে ব্যথা আর কঠোরতার অভিব্যক্তি; চোখ যেন জ্বরের ঘোরে জ্বলছে; এমন কি ওর স্বরও রুক্ষ, বুঝি বা আবেগে অস্থির। এক ভীষণ আবেগে যেন অনুপ্রাণিত; আমার অস্থিরতা সত্ত্বেও অবাক হলাম—বুঝি-বা কিছুটা বিব্রত হয়ে উঠলাম ওর ঐ সৌন্দর্যে। আমরা যে তখন একা।

আলিসা কি কিছু বলেছে, ও দেখা হতেই জিজ্ঞেস করে বসলো।

দুটি কথা যদি বলে থাকে তো যথেষ্ট ; আমি একটু দেরীতেই ফিরলাম কিনা।

জান তো তার বিয়ের আগে আমাকে বিয়ে করতে বলেছে ?

জানি।

আমার দিকে তাকালো—দৃষ্টি স্থির, অচঞ্চল।…

কাকে বিয়ে করতে বলে জানো ?

আমি নিরুত্তর।

তোমাকে ! ও যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

সে কি ! এত পাগলামি !

হাঁ, তা বই কি। ওর স্বরে হতাশা আর বিজয়ের আনন্দ যেন মিশে গেছে। ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বুঝি বা পেছনে হেলেই পড়লো।

আমাকে কি করতে হবে না হবে আমি তা ভাল করেই জানি, ও বাগানের দরজাটা খুলে ফেললে, তারপর সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

আমার মন আর মগজে তখন ঘূর্ণি উঠেছে, রক্তধারা নাচছে কপালের শিরায় শিরায়। আমার আত্মার এই উন্মত্ততায় একমাত্র ইচ্ছাই তখন জাগ্রত—আবেলকে খুঁজে বার করতে হবে। ও-ই হয়তো দুই বোনের এই অদ্ভুত ব্যবহারের বিশ্লেষণে সক্ষম হবে। কিন্তু বসবার ঘরে যাবার মতো সাহস নেই. ভয় হোল, সেখানে গেলে হয়তো সবাই আমার উত্তেজনা আবিষ্কার ক'রে ফেলবে। তাই বাইরে চলে এলাম। বাগানের তুষার-শীতল হাওয়ায় শান্ত হলাম। কিছুক্ষণ কেটে গেল সেখানে। রাত নেমে এল। সাগরের কুয়াশার আড়ালে এখন শহর ঢাকা। গাছগুলি নিষ্পত্র। আকাশ আর মাটি যেন এক অসীম ধ্বংসেরই প্রতীক। গান

বাতাসে ভেসে আসছে, উড়ে চলেছে স্তর থেকে হাওয়ার স্তরে। বড়দিনের গাছের চার পাশে এখন ছেলে-মেয়েদের মেলা বসেছে, ওরা ঐক্যতান তুলেছে। আমি সামনের হল-ঘর দিয়ে ভিতরে এলাম। বসবার ঘর আর ভিতরের হল-ঘরের দরজা খোলা। বসবার ঘর এখন প্রায় নির্জন ; সেখানে মাসিকে দেখতে পেলাম। বসে আছেন, পিয়ানোটা তাঁর চারদিকে আধো-আড়াল রচনা করেছে। জুলিয়েতের সঙ্গে কথা বলছেন। ভিতরের হলঘরে অতিথিরা এখন আলোকোজ্জ্বল গাছের চারপাশে ভিড় জমিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের স্তোত্র শেষ হোল। এখন নীরবতা।

পাদ্রী ভত্তিয়ে গাছের সুমুখে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। তিনি কখনো কথায় ধর্মের বীজ বপনের সুযোগ ছাড়েন না···আলো আর উত্তাপ যেন আমার কাছে তখন অসহ্য ; চলে আসছিলাম। আবেল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো কিছুক্ষণ ধরেই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দিকে ও যেন তীব্র দৃষ্টি মেলে তাকালে। ওর চোখে চোখ মিলতেই ও কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে। ওর কাছে এগিয়ে এলাম।

ও ফিস ফিস করে বললে, বোকা কোথাকার! তারপর হঠাৎ বললে, চল, বাইরে যাই ; এই উপদেশ আর সহ্য হচ্ছেনা!

বাইরে আসতেই বললে, তুমি একটা বোকা! তারপর আমার দিকে উদ্বিগ্ন-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল, কথা বললে না।

বোকারাম, ও তো তোমাকেই ভালবাসে। আমাকে এ-কথা আগে বলতে কি হয়েছিল ?

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বুঝতে চাইলাম না।

না, না! তুমি নিজেই বুঝতে পারনি। আমার হাত ধরে ও ঝাঁকুনি দিতে শুরু করল। সে কি ভীষণ ঝাঁকুনি! নিষ্পেষিত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে হিস্ হিস্ করে উঠলো স্বর, কেঁপে কেঁপে উঠলো।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, আবেল, তোমার কাছে আমার ভিক্ষা—কি হয়েছে আমাকে।বল—আমি তো কিছুই জানি না।

আমার স্বর কাঁপছিল। ও পায়চারি করছিল। ওর সঙ্গে চলতে-চলতে বললাম।

ও হঠাৎ থেমে পড়লো। পথের নিষ্প্রভ আলোয় ও আমার মুখখানার দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলো। তারপর আমাকে কাছে টেনে এনে, আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মাপ কর! আমিও বোকা। ভাই, তোমার চেয়ে আমিও যে সরেশ তাতো নয়।

চোখের জলে শান্ত হোল ব্যথা; মাথা তুলে নিলে। আবার পায়চারি করতে করতে বললে, কি হোল? আবার পুরানো কথা বলে লাভ কি? তোমাকে তো বলেছি, সকালে জুলিয়েতের সঙ্গে আমার কথা হয়। ও তখন উত্তেজিত। কি সুন্দর লাগছিল ওকে! ভাবলাম, আমার জন্যেই বোধ হয় ওর এই রূপ, কিন্তু তা'তো নয়—তোমার কথা আমরা বলছিলাম বলেই ওর ঐ শ্রী ফুটে উঠেছিল।

তখন কি বুঝতে পারনি?

না, ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন তো খুটিনাটিটুকুও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তুমি যে ভুল করছ না তাই বা কি করে জানলে?

ভুল! বাপু, ও-যে তোমার প্রেমে পড়েছে, তুমি অন্ধ না হলে দেখতে পেতে।

তাহ'লে আলিসা…?

আলিসা নিজেকে আহূতি দিচ্ছে, বোনের গোপন কথা সে জেনেছে, সে তাই তোমাকে তার হাতে সঁপে দিতে চায়। দেখ হে

বন্ধু ব্যাপারটা এখন না বোঝার কিছু নেই! আমি আবার জুলিয়েতের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম; আমার প্রথম কথায়, বরং আমার কথা বুঝতে পেরেই বলি—ও সোফা থেকে উঠে পড়ে বার কয়েক বললে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এখন তার স্বর শুনে মনে হোল ওর কোন সন্দেহ নেই।

তুমি এ নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!

কেন করবো না! এ-তো এক আচ্ছা হাসি-তামাসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তারপর কি হোল শোন। ও ছুটে গেল বোনের ঘরে; ওদের স্বর শুনতে পেলাম। এমন উত্তেজিত সে স্বর যে শুনে ভয় পেলাম। আবার জুলিয়েতের সঙ্গে দেখা হবার আশায় ছিলাম, কিন্তু মুহূর্ত পরে যে বেরিয়ে এল সে আলিসা। ওর মাথায় টুপি; আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেল, বললে, কেমন আছ? তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। এই তো সব—আর কিছু নেই।

জুলিয়েতের সঙ্গে আর দেখা হয়নি?

আবেল একটু ইতস্ততঃ করলে।

হাঁ, আলিসা চলে যাবার পর, আমি কামরার দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললাম। জুলিয়েৎ চিমনির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অচল হয়ে, চিবুকে হাত দিয়ে ছিল; নিজেকে দেখছিল বুঝি আরসীতে। আমি এসেছি টের পেয়েও ও ফিরে তাকাল না, শুধু পা দাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আমাকে একা থাকতে দাও। এমন রুক্ষ ওর স্বর যে আর কথাটি না বলে চলে এলাম। এই তো সব!

এখন কি হবে?

তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার উপকার হয়েছে…আর কি হবে? আগে জুলিয়েতের ভালবাসার রোগ সারাও, আলিসাকে আমি যতখানি জানি, ও তা না হলে তোমাকে বিয়ে করবে না।

কিছুক্ষণ তুজনে নিঃশব্দে পায়চারি করলাম।

ও শেষে বললো, চল, ফিরি। অতিথিরা হয়তো এতক্ষণে চলে গেছেন, বাবা হয়তো আমার জন্যে বসেই আছেন।

ভিতরে এলাম। বসবার ঘর প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। ভিতরের হলঘরে গাছের চারপাশে আর ভিড় নেই। ডালপালা এখন রিক্ত, আলোও প্রায় নেবানো। শুধু আছেন আমার মাসি আর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। বুকোলেঁা মামা, মিস আসবার্টন, পাদ্রী, আমার দুই বোন, আর একজন সং-এর মত লোক। বহুক্ষণ ধরে সে মাসির সঙ্গে কথা বলছিল লক্ষ্য করেছি। এবার চিনলাম। ইনিই সেই পাণিপ্রার্থী, যার কথা জুলিয়েৎ আমাকে বলেছিল। আমাদের চেয়ে লম্বা, চওড়া জোয়ান, মাথার চুলে তো পড়ে এল টাক, ভিন্ন শ্রেণীর, ভিন্ন জগতের, ভিন্ন জাতির মানুষ সে, সে যেন বুঝতে পেরেছে, সে আমাদের ভিতরে আগন্তুক। বিরাট তার গোঁফ, একেবারে ধূসর রাজকীয় গোঁফ, অস্থিরভাবে সে গোঁফ চুমরোচ্ছে, তা দিচ্ছে।

হল-ঘরে আলো নেই, দরজা খোলা ; আমরা নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকলাম ; কেউ আমাদের দেখলে না। কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় তখন আমি অধীর।

থামো ! আবেল আমার হাত চেপে ধরে বললে।

দেখলাম আগন্তুক এগিয়ে এল জুলিয়েতের কাছে, ওর হাতখানা ধরলো, ও বাধা না দিয়ে সঁপে দিলে, একবারও ওর মুখের দিকে তাকালে না, আমার বুকের উপর যেন চেপে বসলো গহন রাত।

আবেল ! এ কি হচ্ছে ? ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠলাম, যেন কিছুই বুঝতে পারিনি, অথবা বুঝতে পারব না এই আমার কামনা।

সে ফিসফিস করে বললে, ছোটটি তো বড়টির এককাটি উপরে ! বোন ওকে হারিয়ে দেবে সে জো-টি নেই ! দেবদূতরা যে স্বর্গে এখন করতালি দিচ্ছেন, তাতে ভুল নেই !

আঁদ্রে জিদ্

আমার মামা জুলিয়েতকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। মিস আসবার্টন আর মাসিমা তখন তাকে ঘিরে আছেন। পাদ্রী ভত্তিয়েও এগিয়ে এলেন। আমিও এক পা এগিয়ে গেলাম। আলিসা আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। আবেগ-চঞ্চল আলিসা। বললে, জেরোম, জেরোম, এ'তো হ'তে পারে না—হওয়া উচিত নয়। ও তো ওকে ভালবাসে না। ও তো আজ সকালেই আমাকে বলেছে। বাধা দাও—বাধা দাও! ও! ওর কি দশা হবে?

আমার কাঁধের উপর ও ভেঙে পড়লো হতাশ কাকুতি-মিনতিতে। ওর ওই দুঃখ দূর করতে বুঝি সেদিন আমার জীবন দিতেও পারতাম। হঠাৎ গাছটির কাছ থেকে এল চীৎকার, গোলমাল, চাঞ্চল্য। ছুটে গেলাম। জুলিয়েৎ মাসির কোলে মূর্চ্ছা গেছে, সবাই ওকে ঘিরে আছে, তাই ভাল করে দেখা গেল না। ওর মুখখানা দেখলাম, বড় ম্লান; যেন ওর আলুল চুলের ভারে পিছনে হেলানো। ওর সঙ্কোচন ও বিক্ষেপন দেখে মনে হোল, এ তো সাধারণ মূর্চ্ছা নয়।

বুকোলেঁা মামা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে পাদ্রী ভত্তিয়ে তার তর্জনী স্বর্গের দিকে তুলে, সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন; মাসি এবার তাঁকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বললেন, না, না, ও কিছু নয়! স্নায়ুর ব্যারাম, ভাবাবেগের ফল! মসিয়েঁ তিসিয়ের আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনার তো গায়ে বেশ জোর। আমরা ওকে আমার ঘরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেব। এবার তিনি তাঁর বড় ছেলের কাছে গিয়ে কানে কানে কি বললেন। ওকে চলে যেতে দেখলাম; ডাক্তার ডাকতেই ও ছুটলো।

জুলিয়েৎ আধ-শোয়া অবস্থায় রয়েছে, ওর কাঁধ তুলে ধরলেন মাসি আর অচেনা ভদ্রলোকটি আলিসার পা দু'খানা সস্নেহে জড়িয়ে ধরলো। আবেল মাথাটা তুলে নিলে, নইলে মাথা ঝুলে

পড়তো। দেখলাম ও নুয়ে পড়ে আলুল চুল চুমোয় চুমোয় ভরে দিচ্ছে।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। জুলিয়েতকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আলিসা আবেল আর তিসিয়েরকে কি যেন বললে, শুনতে পেলাম না। ও ওদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল, আমাদের অনুরোধ করলে, যেন ওর বোনকে আমরা বিরক্ত না করি। ও আর প্লাতিয়েঁ-মাসি ঘরে থাকবেন, আর কেউ নয়। আবেল আমার হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এল। রাতের বুকে দুজনে বেরিয়ে এলাম, বহুক্ষণ দু'জনে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। উদ্দেশ্য নেই, সাহস নেই, ভাবনাও বুঝি তখন নেই!

......

পাঁচ

ভালবাসা ছাড়া বাঁচার যে অন্য কারণ থাকতে পারে, তা তখন ভাবতাম না, তাই তাকেই আঁকড়ে ধরে রইলাম। আশা নেই, আশা করবো না বলে মনও তৈরি। আলিসার কাছ থেকে যেটুকু পাব তাই নিয়েই খুশি হব।

পরদিন যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় মাসি চিঠিখানা দিলেন। সবে তিনি চিঠিখানা পেয়েছেন।

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রেও জুলিয়েতের অতিমাত্রায় অস্থিরতা ভোরের আগে ছাড়া কিছুমাত্র কমেনি। আমার অনুরোধ, জেরোম যেন কিছুদিন আমাদের এখানে না আসে। জুলিয়েৎ হয়তো ওর পায়ের শব্দ বা স্বর শুনে চিনতে পারবে। ওর এখন একেবারে নিরিবিলি থাকা দরকার।

জুলিয়েতের এই অবস্থায় আমাকে হয়তো এখানেই থাকতে হবে। তাই জেরোম চলে যাবার আগে ওর সঙ্গে যদি দেখা না হয়, মাসিমণি, তুমি ওকে বোলো, আমি চিঠি লিখবো……

বুকোলেঁদের বাড়ীর দরজা শুধু আমার জন্যেই বন্ধ হয়ে গেল। মাসিমা বা যে-কেউ স্বচ্ছন্দে গিয়ে ঘা মারতে পারবেন, আমার মাসি তো আজ সকালেই যাচ্ছেন। আমি গোলমাল করবো! কি অক্ষম অজুহাত! থাকগে!

বললাম বেশতো, যাবনা।

আলিসার সঙ্গে যে এখনি দেখা হোল না, এতে আমার ক্ষতি যথেষ্টই। কিন্তু দেখা করার সাহস পেলাম না, ভয় হল, ও হয়তো বোনের এই অবস্থার জন্য আমাকেই দায়ী করবে। ওর সঙ্গে দেখা না হলেও আমার সইবে, কিন্তু ওকে বিরক্ত দেখতে তো চাই না।

যাহোক, ঠিক করলাম, আবেলের সঙ্গে দেখা করবো।

ওর দরজায় এসে যখন পৌঁছলাম, পরিচারিকা একখানা ছোট্ট কাগজ দিলে।

তুমি যাতে উদ্বিগ্ন না হও তাই তোমাকে দু-একটা কথা লিখে যাই। লা-হাভারে জুলিয়েতের এত কাছে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য। কাল রাতে তোমার কাছ থেকে চলে এসেই সাউদামটনে যাবার জন্য জাহাজে চড়েছি, ছুটির বাকিটা এস-এর সঙ্গে লণ্ডনে কাটাব। স্কুলে আবার দেখা হবে।

একযোগে সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হোল, মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলাম। আমিও দেরি করতে চাইলাম না, তাতে ব্যথা আরো বাড়বে। স্কুল খোলার আগেই পারীতে চলে এলাম। ভগবানের দিকেই তাকালাম, তাঁর দিকে—যার কাছ থেকে আসবে প্রকৃত সান্ত্বনা আর যথার্থ দান। আমার সমস্ত বিপদ-আপদ তাঁকে সমর্পন করে বসে রইলাম। মনে হোল, আলিসাও বুঝি তাঁরই আশ্রয় নিয়েছে। ও যে প্রার্থনা করছে এতেই আমার আনন্দ, আমার প্রার্থনা যেন ধন্য হয়ে উঠলো।

দীর্ঘদিন ভাবনায় বিভোর হয়ে আর পড়াশুনোয় কেটে গেল। আলিসার লেখা চিঠি আর আমার উত্তর ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার ঘটেনি। ওর চিঠি সব আমি রেখে দিয়েছি; তাদেরই সাহায্যে আমার স্মৃতি যখন ঘোলাটে হয়ে উঠবে তখন শুধরে নেব।

মাসির কাছ থেকে লা-হাভার-এর খবরও পেতাম, প্রথমে ওঁর একার কাছ থেকেই পেতাম। ওর চিঠি থেকেই জানলাম, প্রথম ক'দিন জুলিয়েতের ঐ অবস্থায় কি উদ্বেগেই না কেটেছে। আমার চলে আসার বারোদিন পরে পেলাম আলিসার চিঠি।

আমার প্রিয় জেরোম, আমাকে ক্ষমা কর, তোমাকে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে পারিনি বলে ক্ষমা কর। বেচারী জুলিয়েতের ঐ অবস্থায় সময় একেবারেই ছিল না, তুমি চলে যাবার পরে, ওকে ছেড়ে তো একদণ্ড থাকিনি। মাসিমাকে আমাদের খবর তোমায় জানাতে বলেছিলাম। আশাকরি তিনি

জানিয়েছেন। তুমি বোধকরি জান, জুলিয়েৎ আজ তিনদিন হল ভাল আছে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনো মনে আনন্দ নেই।

রোবার্তের কথা আপনাদের কাছে খুব কমই বলেছি। সেও আমার ক'দিন পরে পারীতে এল। বোনের খবর দিলে। তাই ইচ্ছে না থাকলেও ওরই সঙ্গে আমাকে বহুক্ষণ কাটাতে হোত। যখন কৃষি বিদ্যালয় থেকে ও ছাড়া পেত, তখনি আমি ওর ভার নিতাম। ওকে খুশি রাখবার জন্য কি আমার তখন প্রাণান্ত চেষ্টা!

ওর কাছ থেকে যে কথা শুনলাম—আলিসা বা মাসিকে তা তো জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি। শুনলাম, এডুয়ারেঁ তিসিয়ের জুলিয়েতের খোঁজ খবর নিতে হরবখৎই আসছেন, কিন্তু রোবার্ত যখন পারীতে আসে, তার আগে পর্যন্ত সে তার সঙ্গে দেখাও করেনি। আর একথাও জানলাম, বোনের সঙ্গেও ওর একান্ত মৌনতারই পালা চলছে, কিছুতেই তা ভাঙছে না।

কিছুদিন পরেই মাসির কাছ থেকে জানলাম, জুলিয়েৎ নাকি তার বাগদানের কথাটা জাহির করবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছে। আলিসার আশা ছিল যে, এখুনি ও সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া হবে, কিন্তু তা সত্বেও পীড়াপীড়ি চলছে। পরামর্শ, হুকুম, অনুরোধ সবই ওর দৃঢ় সংকল্পের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে, ঐ সংকল্প যেন ভ্রূর উপরে একখানা ভার বা চোখের উপরে ব্যাণ্ডেজের মতো চেপে বসেছে—ও এখন আরো চুপচাপ।

সময় কেটে গেল, তারপরে বসন্তের আকস্মিক অভ্যাগমের এক সকালে মাসির কাছ থেকে আলিসার একখানা চিঠি এল। তিনি তখন লা-হাভারএ ছিলেন না। সেই চিঠি মাসি পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তার থেকে একটা অংশ নকল করে দিচ্ছি। আমার কাহিনী খানিকটা তাতে বোঝা যাবে।

আমার বাধ্যতার তারিফ করগো মাসিমণি! তুমি যেমনটি পরামর্শ দিয়েছিলে, আমি ঠিক তাই করেছি। মসিয়েঁ তিসিয়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছি। আমি স্বীকার করছি, চমৎকার ব্যবহারই উনি করেছেন, আর তোমাকে বলি, আমার বিশ্বাস হয়েছে, এ বিয়েতে তেমন খারাপ হবেনা। অথচ প্রথম তো সেই ভয়ই ছিল।

জুলিয়েৎ তাঁকে ভালবাসে না এটা ঠিক; কিন্তু যত সপ্তাহ যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে, ওঁর যেন ভালবাসার যোগ্যতা দিন দিন বাড়ছে। বেশ পরিষ্কার ভাবেই উনি ব্যাপারটা বললেন, আমার বোনের চরিত্র সম্পর্কেও ওঁর কোনো ভুল ধারণা নেই। কিন্তু তাঁর নিজের ভালবাসার উপর অগাধ বিশ্বাস, আর একথা বলে গর্ব অনুভব করেন যে, ওঁর পত্নীর প্রতি অনুরাগ দিয়ে এমন কোনো বাধা নেই যা তিনি অতিক্রম করতে পারবেন না। তার মানে, উনি ওকে ভালবেসে ফেলেছেন।

হাঁ, জেরোম আমার ভাইকে নিয়ে পড়েছে দেখে দুঃখই হয়। আমার মনে হয়, ও কর্তব্যের খাতিরেই এমন করছে। কেননা, রোবার্তের চরিত্র ওর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, হয়তো বা আমাকে খুশি করবার জন্যে অমনি করছে—কিন্তু সে হয়তো এতদিনে বুঝেছে যে, যে যত কষ্টসাধ্য কর্তব্য গ্রহণ করবে, তার ততো আত্মার শিক্ষা আর উন্নতি হবে। তুমি হয়তো একে খুব উঁচুদরের কথা ভাবছ, কিন্তু তোমার এই বোকা ভাইঝিকে দেখে খুব বেশি হেসো না! আমাকে এ ভাবনাগুলিই তো শক্তি যোগায়, আর তারই জন্যে তো আজ জুলিয়েতের বিয়ে দিলে ভালই হবে—একথা বুঝতে পেরেছি।

মাসিমণি, তোমার স্নেহের আমার কাছে বড় বেশি দাম, কিন্তু আমাকে অসুখী ভেবোনা। বরং বলতে পারি, ঠিক তার উল্টো। জুলিয়েৎ যে পরীক্ষার ভিতর দিয়ে গেল, তার প্রভাব তো আমার উপরও পড়েছে। ঐ যে বাইবেলের কথাগুলি তেমন করে না বুঝেই আউড়িয়ে যেতাম, আজ তা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, 'মানুষকে যে বিশ্বাস করে সে অভিশপ্ত!' বাইবেলে পড়ার চেয়ে আগে, একখানা বড়দিনের কার্ডে ও কথাটা পাই। কার্ডখানা পাঠিয়েছিল জেরোম। তখন তার বয়স বারো বছরও নয়। আর আমার বয়েস তখন চৌদ্দ। তাছাড়া ওতে একগোছা ফুল আঁকা ছিল। তখন

মনে হোত, কি সুন্দর ফুল! আর ছিল কর্ণেইয়েরির (ফরাসী নাট্যকার) লেখা ক'টি ছত্র।

আমি তো জেরেমায়া (ইহুদী ধর্মজ্ঞানী) র ক'টা সরল কথাই চেয়েছিলাম। কিন্তু জোরোম হয়তো লেখাটা না দেখেই বাছাই ক'রে ছিল কিন্তু এখন ওর চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছে, ওর মনের অবস্থা আমারই মতো। প্রতিদিন ভগবানকে আমি এই বলে কামনা করি, উনি যেন আমাদের তুজনকে একই সঙ্গে কাছে টেনে নেন!

আমাদের সেই আলাপের স্মৃতি ভুলে যাইনি। আগে যেমন ঘন ঘন লিখতাম, এখন আর তেমন লিখিনা, ওর কাজে বাধা দিতে চাই না। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, ওর কথা বলে বলে আমি তার ক্ষতিপূরণ করে নিচ্ছি; পাছে আরো বাড়িয়ে ফেলি, তাই এখুনি চিঠি শেষ করব। আমাকে এবারে বেশি গালাগালি দিওনা কিন্তু!

চিঠি পড়ে কি ভাবনাই না হোল! মাসির এই বাধা দেওয়া (আলিসা কোন্ আলাপের কথা বলেছে? এই জন্যেই ও বুঝি চুপচাপ?) আর চিঠি পাঠাবার এই স্বভাব নিয়ে ওকে গাল দিলাম। আলিসার নীরবতা তো আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমার কাছে যে-কথা বলতে ওর বাধে, অন্য আর একজনকে তো তাই লেখে—সেকথা আমাকে জানতে না দিলেই তো হাজার গুণে ভাল ছিল? চিঠির সমস্তখানিতেই আমার বিরক্তি ধরে গেল; আমাদের এই গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে মাসির সঙ্গে ও এত সহজে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ভেবে বিরক্ত হয়েই উঠলাম। কি ওর ভঙ্গি, কি ওর অন্তরঙ্গতা, আর কি রসিকতা!

আবেল আমার দৈনন্দিন সঙ্গী। সে শুনে বললে, না হে না, তোমাকে লেখা হয় নি, শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছুতেই তোমার বিরক্তি হয়নি।

আবেলই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে তখন আমি কথা বলতে পারতাম। আমার নিঃসঙ্গতায় ওর দিকেই আমার নতুন করে

মন টানতো। কি এক সতৃষ্ণ সহানুভূতির কামনায়, দুর্বলতায়, লজ্জায় আর আমার নিজের দোষে, ওর পরামর্শের প্রতি বিশ্বাস এসে দেখা দিত! স্বভাবে আমাদের প্রভেদ থাক কি না থাক— সেদিন একথা তো ভাবিনি।

ওর লেখার টেবিলের উপর চিঠিখানা মেলে ও বললে, এসো কাগজখানা বিশ্লেষণ করে দেখি।

আমার এই বিরক্তিতে কেটে গেছে তিনটি রাত. চারদিন চিঠিখানার কথা কাউকে বলিনি। আবেল যখন বললে,

তাহলে জুলিয়েৎ তিসিয়ের ব্যাপারটা প্রেমের আগুনেই সঁপে দেবে? আগুনের শিখায় মূল্য তো আমরা জানি। তোমাকে সত্যকথা বলতে কি, তিসিয়ের তো পতঙ্গ—ওর পাখা পুড়ে যাবেই।

ওর ব্যঙ্গ বিশ্রী লাগলো, বললাম, যথেষ্ট হয়েছে, এখন থাক! এখন বাকিটার দিকে নজর দাও।

বাকিটা! সেটাতো তোমার হাতে। তোমার কিন্তু নালিশ করবার কিছু নেই। এখানে হেন ছত্র নেই, হেন শব্দ নেই যাতে তোমার কথা নেই। তুমি একথাও বলতে পার যে, গোটা চিঠিখানা তোমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ফেলিসি মাসি যখন চিঠিখানা তোমার কাছে পাঠিয়েছেন—ঠিক মালিকের কাছেই পাঠিয়েছেন। তোমার বদলে ওর কাছেই আলিসা লেখে, এই যা। কর্ণে ইয়ের ঐ ছত্রক'টার। (ওগুলি কর্ণে ইয়ের নয় রাসিনের) তোমার মাসির কাছে দাম কি? আমি বলছি, ও তোমার সঙ্গেই পত্রালাপ করছে, তোমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে। তুমি একটা হাঁদা, যদি এক পক্ষ পরে তোমার ঐ তুতো বোনটি তোমার কাছে অমনি লম্বা লম্বা চিঠি অনায়াসে আনন্দে বিভোর হয়ে না লিখে ফেলেন তো—

ও কিন্তু ঠিক পথে চলেছে বলে মনে হয় না।

ঠিক পথটা বাতলে দেওয়া তোমার উপর নির্ভর করছে! আমার

পরামর্শ চাও ? ভালবাসা বা প্রেমের কথা আর বলো না ; ওর বোনের এই অবস্থায় ও ঐ ছুটোর উপরই ক্ষেপে গেছে ? ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে ঘা হানো বন্ধু, শুধু অবিশ্রান্তভাবে রোবার্তের কথা বলে যাও—ঐ গাধাটার তত্ত্বতালাস করার মতো তোমার তো ধৈর্য আছে বলেই জানি। ওকে শুধু খবর দিয়ে যাও, বাকিটা আপ্ সে এসে যাবে। উঃ, তোমার বদলে যদি আমাকে চিঠি লিখতে হোত !

তুমি ওর ভালবাসার যোগ্য নও।

তবুও আবেলের পরামর্শই গ্রহণ করলাম। সত্যিই, আলিসার চিঠি যেন খানিকটা দৃপ্ত হয়ে উঠলো কিসের প্রেরণায় ; কিন্তু ওর কাছ থেকে সত্যকার আনন্দের আশাও তখন আমি করছি না ; এ ভাবনা আমার মনে আসেনি যে ও নিজের সংযম হারিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে বসবে—অন্তত জুলিয়েতের শান্তি ফিরে না আসুক, তার ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার আগে তো নয়।

আলিসা ওর বোনের খবর দিলে, তাতে আশাই হোল। বিয়ে হবে জুলাই মাসে। আলিসা আমাকে লিখলে, তখন আমি আর আবেল নিশ্চয়ই পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। বুঝলাম, ও চায়, আমরা বিয়েতে না যাই। তাই আমরা পরীক্ষা কি অন্য কিছুর ওজুহাত দেখালাম, শুধু মঙ্গল কামনা করে অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

বিবাহের এক পক্ষকাল পরে আলিসা আমাকে চিঠি লিখলে—

প্রিয় জেরোম আমার,

কাল আমার কি যে অবাক লাগলো ধারণাও করতে পারবে না। তুমি আমাকে রাসিনের যে কাব্যগ্রন্থখানা দিয়েছ হঠাৎ তার পাতা উলটে দেখি সেই চারটে ছত্র। সেই যে তোমার দেওয়া সেই পুরানো বড়দিনের কার্ডে যে ক'টা ছত্র ছিল—আমি তো আমার বাইবেলের ভিতরে দশ বছর ধরে সেই কার্ডখানা জিইয়ে রেখেছি।

ভেবেছিলাম ঐ ছত্র ক'টা বুঝি কর্ণেইয়েরই। ও নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। কিন্তু পড়তে পড়তে কতগুলো পংক্তি এত ভাল লাগল যে, টুকে না নিয়ে পারলাম না। তুমি নিশ্চয়ই ওগুলো জান—মার্জিনে তোমার স্বাক্ষর দেখেই তা টের পেলাম। (সত্যি, এ আমার এক অভ্যেস, আমি বইয়ের পাতা আমার আর আলিসার নামের আদি অক্ষর দিয়ে ভরে ফেলি। যেখানটা আমার ভাল লাগে, ওকে সেই ভাল-লাগাটা জানাতে চাই—সেখানেই ওর নামের আদি অক্ষর ফুটে ওঠে)। তা যাহোক, তবু নিজেরই তৃপ্তির জন্যে ছত্র ক'টা টুকে রাখলাম, একটু বিরক্ত হয়েছিলুম প্রথমে। আমি যাকে আবিষ্কার করেছি বলে ভাবলাম, তার সঙ্কেত আগেই তুমি দিয়ে রেখেছ! কিন্তু কতক্ষণই বা রইল এ অনুভূতি—ঘন আনন্দে ছেয়ে গেল মন—তুমিও আমার মতো ঐ ছত্রগুলিকে ভালবাস। টুকতে টুকতে মনে হচ্ছিল, তোমার সঙ্গে বসেই যেন পড়ছি। কি সুন্দর, কি সুন্দর! তোমারও কি আমার মতোই এমনি ভাল লেগেছে? আমার এই সংস্করণে একটি ছোট্ট টীকায় লেখা আছে, মাদাম দ্য সেভেঁনো যখন শুনলেন মাদামোজেল দ্য অমেল এইটি গাইছেন, তিনি তো অবাক হয়ে গেলেন। দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরলো, তিনি তাকে আবার গাইতে বললেন। আমার তো মুখস্ত হয়ে গেছে ছত্র ক'টা। আপন মনে খালি আওড়াই। ক্লান্ত তো হইনে। শুধু আমার এক দুঃখ, তুমি কি ভাবে পড় শুনতে পেলাম না!

আমাদের পরিব্রাজকদের খবর তো বেশ ভাল। তোমাকে তো লিখেছি, বেয়োনে আর বিয়ারিৎস দেখে জুলিয়েতের কত আনন্দ! অসহ্য গরম হলেও ভাল লেগেছে। ওরা তারপরে ফন্তারেবিয়া দেখেছে, বার্গোসে কাটিয়েছে কয়েক দিন—পীরেনিস তো দু-দুবার পার হোল। মন্তসেরাৎ থেকে আমাকে লিখেছে এক উৎসাহপূর্ণ চিঠি। নিমেস-এ ফেরার আগে বার্সেলোনায় আরো দশটি দিন কাটাবে। এদুয়ারকে সেপ্টেম্বরের আগেই ফিরতে হবে, তখন মদ চোলাই-এর ব্যাপারে খবরদারি করতে হবে তো।

আমি আর বাবা আজ এক হপ্তা হোল ফোঁগেসমিরে আছি। মিস আসবার্টন আর রোবার্তকে আশা করছি। চারদিনের ভিতরেই ওরা এসে যাবে। তুমি তো জানই, বেচারী পরীক্ষায় ফেল করেছে। প্রশ্ন শক্ত ছিল

বলে নয়, পরীক্ষক এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করেছিলেন যে ও নাকি ঘাবড়ে যায়। আমি তোমার কাছে ওর পড়াশুনোয় মনোযোগের কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারি না যে ও তৈরি ছিল না। কিন্তু ঐ পরীক্ষকমশাই বোধহয় ছাত্রদের অমনি বিভ্রান্ত করে দিয়েই আনন্দ পান।

তোমার সাফল্যে আমি তো অভিনন্দন জানাতে সাহস করি না জেরোম, তোমার তো নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস। আমি তাই ভাবি, আমার মন আশায় ভরে ওঠে। তুমি যে কাজের কথা বলতে, তা কি এখুনি শুরু করে দিতে চাও?

বাগানে কিছুই বদলায় নি; বাড়ি তো ফাঁকা! তুমি বুঝতে পার নি? আমি তো তোমাকে এবারে আসতে বলি নি। মনে হয় তাই-ই ভালো। নিজের মনে মনে তো রোজই সেই কথা বলি। তোমাকে না দেখে এত দীর্ঘ দিন কাটানো তো কঠিন। কখনো বা নিজের অজ্ঞাতে তোমার আশায় বসে থাকি, পড়তে পড়তে থেমে যাই। ফিরে তাকাই তাড়াতাড়ি··· মনে হয়, তুমি আছ আমার পাশে।

চিঠি লিখছি। এখন রাত, সবাই ঘুমে। অনেক রাত জেগে লিখছি চিঠি। সামনে খোলা জানালা। বাগান সুগন্ধে ভরা। হাওয়া উষ্ণ। মনে পড়ে, যখন আমরা ছিলাম ছোট, সুন্দর কিছু দেখলে বা তার কথা শুনলে—নিজেরা বলাবলি করতাম, ভগবানকে তাঁর এই সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ। আজ রাতে তো আমার আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে পড়ছে—রাত যে এত সুন্দর করে তুলেছ—এর জন্যে ধন্যবাদ প্রভু! হঠাৎ তোমাকে মনে পড়ছে। তোমাকে কাছে চাইছি—তোমার সত্তা অনুভব করছি আমার সান্নিধ্যে—এমন সে উদগ্রতা, মনে হয় তুমিও তা অনুভব করছ।

তোমার চিঠিতে লিখেছ, হৃদয় যদি উদার হয়, সেখানে প্রশংসা তো হারিয়ে যায় কৃতজ্ঞতায়। ঠিকই বলেছ! কত কি তোমাকে লিখতে ইচ্ছে করছে। মনে পড়ছে, জুলিয়েৎ যে আনন্দোজ্জ্বল দেশের কথা বলেছে। অন্যান্য দেশের কথাও মনে পড়ছে। কত বিস্তীর্ণ তারা, আরো উজ্জ্বল—আরো নিস্তব্ধ—মরুভূমির নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছে। আমার যেন কেমন এক অদ্ভুত বিশ্বাস—এক দিন—জানি না কি করে তা সম্ভব—একদিন তুমি

আর আমি যাব রহস্যময় অজানা দেশে—কিন্তু জানি না তো সে কোন্ দেশ…

আপনারা বুঝতেই পারছেন কি আনন্দবিহ্বলতায় ঐ চিঠি পড়লাম—ভালবাসার কত দীর্ঘশ্বাস ভেঙে ভেঙে পড়লো। আরো চিঠি আসতে লাগলো। আমি যে ফোঁগেসমিরে যাই নি এর জন্যে আলিসা আমাকে ধন্যবাদ জানালে। আমাকে এ বছরে সে তার সঙ্গে দেখা করতেও বারণ করলে, সবই সত্যি কথা ; কিন্তু তবু আমার অনুপস্থিতিতে ও দুঃখিত সেকথা বুঝতে পারলাম। ও আমাকে চায়। পাতার পর পাতায় বেজে উঠলো সেই একই আবেদন—অনুরোধ। আমি কি করে সে অনুরোধ না-মঞ্জুর করবো। আবেলের পরামর্শে হঠাৎ আমার আনন্দ নিঃশেষ হয়ে যাবে আর প্রকৃতিগত সহনশক্তি মনের কামনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সেই আশঙ্কায় আমি তখন অধীর। আমার গল্পে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই চিঠিগুলো থেকে তুলে তুলে দেব।

প্রিয় জেরোম,

তোমার চিঠি পেয়ে আমার মন তো আনন্দে গলে গেল। অরভিয়েতো থেকে তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। পেরুগিয়া আর আসিসি থেকেও দুখানা এসে যাবে। আমার মন তো এখন ভ্রাম্যমান ; আমার দেহটাই শুধু পড়ে আছে। সত্যিকথা বলতে কি আমি যেন তোমার সঙ্গে চলেছি আম্‌ব্রিয়ার শুভ্র পথে। রওনা হয়েছি সেই কোন্ ভোরে, ঊষার উদয় দেখলাম নতুন চোখে। এ যেন নতুন সৃষ্ট চোখ…তুমি কি কোরোতনার ঐ ছাদের উপর থেকে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলে ? তোমার ডাক আমি শুনেছি। আসিসির পাহাড়ে আমরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীরা কত ভাল—ওঁরা এনে দিলেন জল ! বন্ধু, তোমার চোখ দিয়েই আমি সব দেখছি। তুমি সন্ত ফ্রান্সিস সম্বন্ধে যা লিখেছ, পড়ে যে কত ভাল লেগেছে ! হাঁ, আমাদের যে খুঁজে পেতে হবে সত্য—তাই না ?—মনের বিকাশ, আনন্দ—মুক্তি তো নয়,

মুক্তি তো ঘৃণিত গর্বের সাথী। আমাদের আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহে পর্যবসিত হবে না, সেবাই হবে তার লক্ষ্য।

নিমেসের খবর এত ভাল যে আমার তো মনে হয়, এত আনন্দ তো ভগবানেরই দান। ভগবানকেই ডাকি, শক্তি দাও এমন আনন্দ উপভোগ করতে! শুধু আমার মনে বিষাদের ছায়া পড়েছে বাবার অবস্থায়। আমার সমস্ত সেবাযত্ন সত্ত্বেও তিনি যেন কেমন মুষড়ে পড়েছেন, উনি যখন একা থাকেন তখনই বিমর্ষ হয়ে পড়েন, ওঁর এই বিষণ্ণতা দূর করা তো ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। আমাদের চারদিকে প্রকৃতির আনন্দ যে ভাষায় কথা কয়ে উঠছে উনি তো তা বোঝেন না। বুঝতেও চেষ্টা করেন না, মিস আসবার্টন ভালই আছেন। ওঁদের কাছে তোমার চিঠি পড়ে শোনাই; প্রতিটি চিঠিই দিন তিনেকের কথা বলার খোরাক যোগায়। আবার আসে নতুন চিঠি।

রোবার্ত পরশু চলে গেল। ওর বন্ধুর সঙ্গে ছুটিটা কাটাবে—ওর বাবা একটা আদর্শ খামারের পরিচালক। আমাদের এখানকার জীবনধারা ওর সহ্য হচ্ছিল না। ও যেতে চাইলে ওকে উৎসাহই দিলাম।

...কত কথা তোমাকে বলার আছে। কথা বলার জন্য আমি তো তৃষ্ণাতুর, উদ্‌গ্রীব—উঃ, কি সে কথা—অফুরন্ত—বিরামহীন! কখনও বা কথার ভাষা যোগায় না, ভাবধারাও অস্পষ্ট হয়ে ওঠেনা। এই তো আজ সন্ধ্যেয় যেন স্বপ্নের ঘোরে লিখে চলেছি—মন অস্থির—মনে হচ্ছে অসীম ঐশ্বর্য দেব বিলিয়ে—প্রতিদানেও তো পাব।

এতদিন দুজনে চুপ করে ছিলাম কি করে? অনেক জীব যেমন শীত-কালটা ঘুমিয়ে কাটায়, তেমনি আমরা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আর যেন সে শীতের স্তব্ধতা ফিরে না আসে! আবার আমি খুঁজে পেয়েছি তোমাকে, পেয়েছি আমার জীবন, আমার চিন্তাধারা, আমার আত্মা। সব কিছুই তো এখন সুন্দর লাগছে। সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে···আর যে অফুরন্ত উর্বরা হয়ে উঠেছে।

১২ই সেপ্টেম্বর

পিসায় বসে তোমার চিঠি পেলাম। এখানে আবহাওয়া খুবই চমৎকার, নর্মাণ্ডি এত সুন্দর কখনো তো ভাবি নি। পরশু অনেক দূর বেড়াতে গিছলাম। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। যখন

ফিরলাম, খুব বেশি ক্লান্ত হইনি, কিন্তু উত্তেজনা তখন এসে গেছে। সুখ আর আনন্দে আমি তখন মাতাল। স্বপ্নোজ্জ্বল সূর্য কিরণে খড়ের গাদাগুলি কি সুন্দর! চারদিক এত সুন্দর ইতালীতে যে আছি সে কল্পনা করবারও দরকার নেই।

হাঁ গো বন্ধু, তুমি যে বল, এ এক উদ্বেল আনন্দের উচ্ছ্বাস—সেই উচ্ছ্বাস আমি শুনতে পাচ্ছি প্রকৃতির ঐক্যতান স্তোত্রে, পাখির গানে; প্রতিটি ফুলের ঘন সুগন্ধে আমি পাচ্ছি; এবং আজ যেন সত্যি করে বুঝতে পারছি পূজাই হচ্ছে একমাত্র প্রার্থনা। সন্ত ফ্রান্সিসের সঙ্গে সমস্বরে বলছি, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর! আর কিছু তো নয়—আমার বুক এক অনির্বচনীয় ভালবাসায় ভরে গেছে।

ভয় পেয়ো না। আমি মূর্খ হয়ে থাকছি না। অনেক পড়ে ফেলেছি এরই মধ্যে, কয়েকটা বৃষ্টির দিনের দৌলতে আমার অর্ঘ্য আমি বইয়ের ভিতরেই ঢেলে দিয়েছিলাম। মেলেব্রাঁসে শেষ হোল লাইবিনিৎস-এর ক্লার্কের কাছে চিঠি শুরু করেছি। তারপর বিশ্রাম হিসেবে পড়ছি শেলীর চেঞ্চি (একখানি নাটক)—আনন্দ পাইনি; স্পর্শাতুর উদ্ভিদ কবিতাটিও পড়েছি। তোমাকে খুব চটিয়ে দিচ্ছি বোধ হয়। কিন্তু শেলী আর বায়রণের সমস্ত কবিতা কীটস্-এর চারটে ওডস্এর (কারও উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা) জন্যে বিসর্জন দিতে পারি। গত গ্রীষ্মে ঐ ক'টি কবিতা তো আমরা পড়েছিলাম। যেমনি আমি হুগোর সমস্ত কাব্যসংগ্রহ বদলেয়ারের ক'টা চতুর্দশপদী কবিতার জন্যে বিসর্জ্জন দিতে পারি। 'মহা কবি'র কোনো মানে হয় না,—আসল কথা হচ্ছে বিশুদ্ধ কবি চাই—চাই খাঁটি কবি। ভাই তোমাকে ধন্যবাদ—তুমি আমাকে এই সব জিনিস ভালবাসতে আর বুঝতে শিখিয়েছ।

না, না, কয়েকদিনের সাক্ষাৎকারের জন্য তোমার ভ্রমণে যেন ছেদ না পড়ে। আর সত্যি কথা—আমাদের এখনো দেখা করার সময় হয় নি। বিশ্বাস কর, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে, তোমার কথা

তো এমন করে মনে পড়ত না। তোমাকে দুঃখ দিতে আমার ব্যথা লাগে, কিন্তু তোমার উপস্থিতি তো আমি চাই না। এখন চাই না। আমি কি খুলে বলব? যদি শুনি আজ সন্ধ্যেয় তুমি আসছ—আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব।

দোহাই তোমার; এই অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে বোলো না। শুধু জানি, তোমার কথা আমি অবিরাম ভাবি (তোমার আনন্দের পক্ষে তাই তো যথেষ্ট)। আমি তো তাতেই সুখী।

এই শেষ চিঠির কিছুদিন পরে, ইতালী থেকে ফিরে এলাম। তারপরই সামরিক বিভাগ থেকে আমার ডাক পড়লো। ন্যান্সিতে আমাকে পাঠানো হোল। কাউকে সেখানে চিনি না, তবু একা থাকতে ভালই লাগলো। ওর চিঠিই যে আমার একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র আশ্রয়—আমার প্রেমের গর্বে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। আলিসার কাছেও তো তা তখন সুস্পষ্ট। রোসাঁর যেমন বলেছিলেন: এই আমার একমাত্র উপলব্ধি—এও যেন তাই।

সত্যিকথা বলতে গেলে আমি তখন কঠোর নিয়মনিষ্ঠাকে সানন্দে গ্রহণ করেছি! সহনশক্তিতে তখন আমি জড় বনে গেছি, শুধু আলিসার কাছে চিঠিতে তার অনুপস্থিতিরই নালিশ করছি। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদে আমরা যেন পরীক্ষার আভাস পেলাম—এ পরীক্ষা তো আমাদের শৌর্যেরই উপযুক্ত। আলিসা লিখলে, তুমি তো এমন মানুষ, কখনো নালিশ করো না, তুমি যে দ্বিধাগ্রস্ত হবে—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না। ওর কথার এই সত্য প্রমাণ করতে গিয়ে কিই না আমি সহ্য করছিলাম?

আমাদের শেষ দেখা হবার পরে প্রায় এক বছর কেটে গেল। ওর তো বুঝি সে খেয়ালও নেই—ও ওর প্রতীক্ষার দিন গুনতে তখন সবে শুরু করেছে। তাই ওকে ভর্ৎসনা করলাম।

ও উত্তর দিলে, অকৃতজ্ঞ! তোমার সঙ্গে কি আমি ইতালীতে যাইনি? একদিনের জন্যও তো ছাড়াছাড়ি হয়নি। তোমার তো একথা বোঝা উচিত। কিন্তু কিছুদিনের জন্য আমি আর তোমাকে অনুসরণ করতে পারব না। একেই তো আমি বলি বিচ্ছেদ। আমি বহু চেষ্টা করে দেখেছি, তোমাকে সৈনিক হিসেবে কল্পনা করতে, কিন্তু আমি তো পারিনি। রুয়ে গ্যামবেতায় তোমার খুদে ঘরখানিতে তোমাকে বড় জোর কল্পনা করা যায়। তুমি সেখানে বসে লিখছ কি পড়ছ—না, তাও বুঝি ঠিক করে পারি না। শুধু ফোঁ'গেমমিরে কি লা-হাভারেই তোমাকে আমি একবছর আগে যেন দেখতে পাচ্ছি। আর কোথাও তো নয়।

এক বছর! যেদিন গুলি গত হয়ে গেছে, তাকে তো গুনে গুনে জিইয়ে রাখিনা, আমার আশা এখন ভবিষ্যৎমুখী। সে ভবিষ্যৎ তো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তোমার কি সেই নীচু দেয়ালের কথা মনে আছে, যেখানে ছিল চন্দ্রমল্লীর ঝাড়—সেই যে বাগানের একেবারে প্রান্তে—আমরা কখনো বা সেই দেয়ালের উপরও চড়ে বসতাম। জুলিয়েৎ আর তুমি তো ওর উপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যেতে—মনে হোত যেন মুসলমান চলেছে সোজা বেহেশ্‌তে; আর আমি এক পা-দুপা গেলেই মাথা ঘুরে উঠতো, তোমরা নীচ থেকে আমাকে ডাকতে আর বলতে—নিজের পায়ের দিকে তাকিওনা! চোখ সামনে রাখ। থেমো না! যেখানে যাবে সেইদিকে তাকাও! তারপরে তো এসে পৌছতাম। ওগুলি তো শুধু বুলিই নয়, একেবারে দস্তুরমতো সাহায্য। তুমি দেয়ালের আর একপ্রান্তে উঠে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। আর তো কেঁপে উঠতাম না; মাথাও ঘুরত না; তোমাকে ছাড়া আর কিছু তো দেখতে পেতাম না; ছুটতাম—তারপরে তো তোমার প্রসারিত বাহুর আশ্রয় ছিলই।

জেরোম, তোমার উপরে যদি বিশ্বাস হারাই, আমার কি উপায় হবে? তোমার শক্তি অনুভব করতে আমি চাই—সে আমার প্রয়োজন—তোমাকে অবলম্বন করা আমার প্রয়োজন। তুমি দুর্বল হোয়ো না।

তুচ্ছ করবার মোহে প্রতীক্ষার দিনগুলি আরো ইচ্ছে করেই আরো বাড়িয়ে দিলাম হয়তো ভয়ও ছিল—কি জানি সাক্ষাৎকার

হয়তো সন্তোষজনক হবে না। আমরা শেষে এই ঠিক করলাম, বড়দিনের ছুটিটা আমি পারীতে মিস আসবার্টনের ওখানে কাটাব।

আপনাদের আগেই আমি বলেছি, আমি ওর সবগুলো চিঠি উদ্ধৃত করব না। এই তো এইখানা পেয়েছিলাম ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ।

পরশু রুয়ে গু পারী দিয়ে যেতে যেতে আবেলের বইখানা এম-এর দোকানের সামনের আলমারীতে দেখে খুবই আনন্দ হোল। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে রাখা হয়েছে বইখানি। আমি ভেতরে না ঢুকে পারলাম না ; কিন্তু নামটা এমন হাস্যকর যে দোকানীকে বলতেই তো দ্বিধা হোল। অন্য যে কোনো একখানা বই নিয়ে চলে যাবারই উপক্রম করছিলাম। আমার ভাগ্য ভাল, কাউন্টারের কাছে ওর 'অশ্লীলতাময়ী'র একটা ছোট্ট গাদা রাখা ছিল খদ্দেরদের জন্যে, আমি তার থেকে একখানা বই নিয়ে টাকাটা রেখে দিলাম কাউন্টারের উপর। কিছু বলতে হোল না।

আবেল যে আমাকে বই পাঠায়নি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ! বই পড়ে লজ্জিত না হয়ে পারিনি! বইয়ের জন্য লজ্জা নয়—বইয়ের ভিতরে অশ্লীলতার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা বেশী! কিন্তু আমার এই বড় লজ্জা যে আবেল—তোমার বন্ধু আবেল ভত্তিয়ে লিখেছে এমন বই! পাতার পর পাতা তন্নতন্ন করে এমন কোনো 'মহতী প্রতিভার' সন্ধান পেলাম না, যা আবিষ্কার করে ফেলেছেন আমাদের তেঁপের সমালোচকটি। আমাদের লা-হাভারের ছোট সমাজে, আবেলের কথা তো প্রায়ই হয়। ওরা বলে বইখানি নাকি জোর নাম কিনেছে। কিন্তু আমি তো ওতে ওর দুরারোগ্য মানসিক বিকার দেখতে পাই যাকে লোকে বলে 'হালকা চাল' আর সৌন্দর্য। অবশ্য আমি বিজ্ঞজনের মতো চুপ করেই থাকি। তোমাকে ছাড়া কাউকে বলিনি যে, আমি বইখানা পড়েছি। বেচারী পাদ্রী ভত্তিয়ে—প্রথমে তো দেখা গেল তিনি গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছেন—আর তাইতো হওয়া উচিত—এখন তিনি হয়তো ভাবছেন, গর্বিত হবারও কিছু থাকতে পারে ; তাঁর সমস্ত পরিচিতরা তাঁকে একথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেড়াপীড়ি করছেন। কাল, প্লতিয়ে মাসির (আমার পিসি) ওখানে মাদাম ভি-ওঁকে হঠাৎ বলে বসলেন, পাদ্রী, আপনি তো সুখী।

আপনার ছেলের এত বড় সাফল্য—এতো গর্বেরই বিষয়। উনি লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি এখনো অতদূর এগোতে পারিনি! আপনাকে গর্বিত হতেই হবে মাসী সরল ভাবেই বুঝি বললেন। কিন্তু এমন উৎসাহ দেখা দিল স্বরে যে, সবাই হাসতে লাগলো।

যখন নতুন আবেলার্দ বেরুবে তখন কি হবে? শুনলাম বুলেভারের কোন্ থিয়েটারে নাকি অভিনয় হচ্ছে, এখুনি নাকি কাগজগুলো বইখানির কথা বলতে শুরু করেছে! বেচারী আবেল! এই সাফল্য কি ও চেয়েছিল? ও কী এতে সন্তুষ্ট হবে?

'আত্মার সান্ত্বনায়' কাল পড়ছিলাম, মানুষের সমস্ত মহিমা, পার্থিব সম্মান, আড়ম্বর, তোমারই চিরন্তন মহিমার কাছে তো তুচ্ছ; সে তো মূর্খতা। আমি ভাবলাম, ভগবান, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে, তুমি জোরোমকে তোমার স্বর্গীয় মহিমার জন্য নির্বাচিত করেছ—তার কাছে অন্য সবই তুচ্ছ—সবইতো মূর্খতা।

সপ্তাহ আর মাস এই একঘেয়ে কাজে কেটে গেল; স্মৃতি আর আশা ছাড়া তো এমন কিছু ছিল না যার কথা আমি চিন্তা করতে পারি। সময় কত ধীরে ধীরে বয়ে গেল, কত দীর্ঘ প্রহরগুলি তা তো আমার আর খেয়াল রইল না।

মাসি আর আলিসা জুলিয়েতের সঙ্গে দেখা করতে জুনে নিমেস যাবেন। ওর ওখানে ছেলেপুলে হবার কথা। ওর স্বাস্থ্যের গতিক সুবিধের নয় ভেবেই ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

(আলিসা লিখলে) লা- হাভারের ঠিকানায় লেখা তোমার শেষ চিঠিখানা আমাদের চলে আসবার পর এসে পৌছায়। মাত্র এক সপ্তাহ পরে যে হঠাৎ কি করে পেয়ে গেলাম ভেবে তো কুল পাইনে। সারা সপ্তাহটা আমি এমন মনমরা হয়েছিলাম— মনে হচ্ছিল যে আমার যেন আত্মা আধমরা হয়ে আছে—সে এক দীনহীন করুণা করবার মতো আত্মা। ভাই—তোমার সঙ্গে থাকলে আমি নিজেকে ফিরে পাই—বেশী করেই ফিরে পাই।

জুলিয়েৎ ভালই আছে। প্রতিদিনই প্রসব বেদনার আশা করছি। তবে অযথা উদ্বেগ নেই। ও জানে আজ ভোরে আমি তোমার কাছে এখন চিঠি লিখছি।

আমাদের পৌঁছবার পরের দিনই ও এসে আমাকে বললে, আর জেরোমের খবর কি? এখনো কি তোমাকে চিঠি লেখে? ওকে সত্যি কথা না বলে পারলাম না। সে বললে, ওর কাছে যখন লিখবে···ওকে বলো—একটু দ্বিধা করলো, তারপর মিষ্টি হাসি হেসে বললে, আমার কিন্তু রোগমুক্তি হয়েছে। আমার তো ভয় হয়েছিল, ওর চিঠিতে যেরকম আমুদেভাব দেখেছি তাতে তো মনে হয় ও ভান করছে। আগে যার স্বপ্নও দেখেনি, আজ তো তারই ভিতরে ও সুখ খুঁজে পেয়েছে। এক সময়ে তো মনে হোত, আগের দিনের জীবনের সেই ভালবাসাতেই ছিল তার সুখ! একে আমরা বলি ভালবাসা, আত্মার একি এক প্রধান অঙ্গ! এর বহিরঙ্গটা তো গৌণ। আমি তোমাকে আমার এই ভাবমন্থন থেকে রেহাই দিচ্ছি, আমি যখন বেড়াই, আমি কি ভাবি জান—অবাক হয়ে যাই যে কেন সুখী আমি নই। জুলিয়েতের সুখে তো আমার মনে আনন্দই হওয়া উচিত।···কিন্তু তবু মনে কেন এই দুর্বোধ্য বিষাদ—এর বিরুদ্ধে তো লড়াই চলেনা? গ্রামাঞ্চলের এই সৌন্দর্য আমি তো অনুভব করি, আমি তো ওকে জানি—কিন্তু সে তো আমার এই অনির্বচনীয় বিষাদে ভরে যায়। তুমি যখন আমাকে ইতালী থেকে চিঠি লিখতে, তোমার ভিতর দিয়ে সবকিছু আমি দেখতাম; এখন তো আমার মনে হচ্ছে তোমাকে ছাড়া যা দেখছি তার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে রাখছি। ফোঁগেসমির আর লা-হাভারে আমি নিজেকে যেন দুঃসময়ের জন্য জিইয়ে রাখছিলাম; এখানে তো দরকার নেই—এখানে সুযোগও নেই। এখানকার এই হাসি, গ্রামাঞ্চলের এই আনন্দধারা আমাকে আঘাত করে; হয়তো আমি যাকে বিষাদ বলছি, হয়তো তা এত গোলমেলে ব্যাপার নয়। আগে আমার গর্বই ছিল আনন্দ, কিন্তু আজকাল এই অজানা আনন্দের স্রোতে আমি যা অনুভব করি সে তো অপমানেরই নামান্তর।

এখানে এসে তো প্রার্থনাই করতে পারছিনা, আমার এমন শিশুসুলভ অনুভূতি দেখা দিয়েছে যে, ভগবান বুঝি আর আগেকার জায়গায় নেই। আসি এবার, এবার থামবো। এই যে নাস্তিকতা, এই যে দুর্বলতা আর বিষণ্ণতা এর জন্যে আমি লজ্জিত। এসব স্বীকার করে, তোমার কাছে জানিয়ে, আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি—আজ রাতে যদি ডাকে না দিই—কাল আমি হয়তো ছিঁড়েই ফেলব এ চিঠি।

আঁদ্রে জিদ্

পরবর্তী চিঠিতে সদ্যোজাতা বোনঝির কথাই শুধু লিখলো। সে হবে তার ধর্ম-মা, জুলিয়েৎ আর আমার মামার আনন্দের কথা জানালে। ওর নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে জানাবার তো কথাই ওঠেনা।

তারপরে ফোঁগেসমিরের তারিখ দেওয়া চিঠি এল। জুলিয়েৎ জুলাই মাসে সেখানে ছিল।

এত্বয়ার আর জুলিয়েৎ আজ ভোরে চলে গেল। আমার ছোট্ট বোনঝিটির জন্যেই আমার বড় খারাপ লাগছে। আবার ছ মাস পরে যখন দেখা হবে, তখন তো ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী আমার কাছে অচেনাই ঠেকবে; অথচ নিজের চোখে ওর প্রতিটি ভঙ্গী তো আমার মুখস্থ; আমি তো ওকে ঐগুলো আবিষ্কার করতে দেখেছি। মানুষ যখন বাড়ে সে তো এক অবাক ব্যাপার—রহস্যময় বলেই মনে হয়; আমাদের মনোযোগ থাকে না বলেই আমরা অবাক হইনে। কত প্রহরের পর প্রহর এই ছোট্ট দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ে কাটিয়েছি—কত আশা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ওই ছোট্ট শিশুর ভিতরে। কোন্ স্বার্থপরতায়, কোন্ গর্বে, উন্নতির কোন্ আশাহীনতায়—এমনি করে মানুষের পরিণতি থেমে যায়—প্রতিটি জীব এমন হয়ে ওঠে? কি করে তারা ভগবানের থেকে দূরে সরে যায়! আমরা যদি তাঁর কাছে পৌছতে পারতাম—ভাবতো কি আমার আনন্দ হোত!

জুলিয়েৎকে খুব সুখী বলেই মনে হয়। জেনে খুব দুঃখ পেলাম, ও ওর পিয়ানো বাজানো ছেড়ে দিয়েছে, পড়াও ছেড়েছে। কিন্তু এত্বয়ার তিসিয়ের আবার গান-বাজনা পছন্দ করে না; বইয়েও তেমন ঝোঁক নেই; ও যাতে আনন্দ পায় না, সেদিকে নিজের আনন্দের সন্ধানে না গিয়ে ও নিশ্চয়ই বুদ্ধির কাজ করেছে। আবার অন্যদিকে, স্বামীর পেশায় ওর অনুরাগ যথেষ্টই। স্বামীও নিজের ব্যবসায়ের কথা ওকে বলে। এবছর এটা আরো বেড়েছে; ও বলে বিয়ে হয়েছে বলেই ও লা-হাভারে একটা মস্তবড় খদ্দের পেয়েছে। ও যখন ব্যবসা উপলক্ষে বাইরে ছিল, তখন ওর সঙ্গে ছিল রোবার্ত। এত্বয়ার ওর প্রতি ভারী সদয়। সে বলে রোবার্তকে নাকি ও চিনে ফেলেছে। ওই এই কাজে মন দিতে পারে এ বিষয়ে নাকি ও হতাশ হয়নি।

বাবা এখন আগের চেয়ে ভাল আছেন; মেয়ের সুখে উনি আবার যেন

যুবক হয়ে গেছেন, খামার আর বাগিচা নিয়ে তিনি আবার লেগেছেন ; আবার আমাকে বই পড়ে শোনাতে বলছেন। মিস আসবার্টন আসার পর তো রোজই বই পড়ে শোনাতাম। এদুয়ার আসায় তা বন্ধ হয়ে যায়। ওদের এখন আমি হুব্‌নারের ভ্রমণ কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছি। নিজেরও খুবই ভাল লাগছে। আমার নিজের পড়ারও যথেষ্ট সময় পাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে আমার কিছু পরামর্শ দরকার ; আজ সকালে তো বইয়ের পর বই নিয়ে বসেছি কিন্তু একখানাও পড়তে ইচ্ছা হয় না।

আলিসার চিঠি এবার থেকে আরো যেন উদগ্রতায় ভরা, কি যেন এক আশংকায় উদ্বেল।

তোমাকে বিরক্ত করব বলেই বলতে ভয় পাই যে, তোমাকে আমি কতখানি কাছে পেতে চাই (গ্রীষ্মের শেষ দিকে এল এই চিঠি)। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে যতগুলি দিন কাটাতে হচ্ছে সেগুলি তো গুরুভার হয়ে আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আরো দু'মাস। তোমাকে ছাড়া যে সময়টা কাটালাম, এই দুটো মাস তো তার চেয়েও দীর্ঘ বলে মনে হয়। সময় কাটাবার জন্যে যা কিছু করতে চাই, মনে হয় কি নিষ্ফল প্রয়াস—কোনো কিছুতেই মন বসে না। আমার বইগুলিরও যেন আর আকর্ষণী শক্তি নেই—গুণ নেই। বেড়ানোও ভাল লাগে না। প্রকৃতি তার জৌলস হারিয়েছে। রং আর সুগন্ধ নিঃশেষিত হয়ে গেছে বাগানের।

তোমার প্রথম ফেক্ খাটা আর বাধ্যতামূলক কুচকাওয়াজের কথা পড়ে তোমার উপর আমার ঈর্ষা হচ্ছে। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছ, দিন কেটে যাচ্ছে এই কাজে, আর রাতে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ছ। তুমি যে সমর-কৌশলের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছ, আমার মনে তো তা হানা দিচ্ছে। ক'রাত ঘুম হয়নি। কুচকাওয়াজের বাঁশীর শব্দ শুনে ঘুমের ভিতরে জেগে জেগে উঠছি···সত্যিই যেন কানে শুনছি। তুমি যে আনন্দের কথা বলেছ তা আমি কল্পনা করতে পারি। সে তো ভোরের আনন্দ, কেমন এক উচ্ছলতা···মালজিভিলের সেই মালভূমি—এখনো কি সুন্দর উষার প্রথম শীতল দীপ্তি সেখানে ছড়িয়ে আছে!

বন্ধু, এই আমার শেষ চিঠি। তোমার ফিরে আসার তারিখ যতই অনির্দিষ্ট হোক, আর বেশী দেরী তো হবে না। আমিও আর চিঠি লেখার

সুযোগ পাব না। ফোঁগেসমিরে দেখা হলেই ভাল হোত, কিন্তু ঝড়জল শুরু হয়েছে এখানে। ভারী শীত। বাবা খালি শহরে ফেরার কথা বলছেন, জুলিয়েৎ আর রোবার্ত তো এখন নেই, তুমি আমাদের এখানে এসে স্বচ্ছন্দে থাকতে পার—কিন্তু তোমার ফেলিসি মাসির কাছে যাওয়াই ভাল, উনি তোমাকে পেয়ে খুশিই হবেন।

আমাদের সাক্ষাতের দিন যতই এগিয়ে আসছে আমি আশংকায় উদ্বেল হয়ে তাকিয়ে আছি, ভয়ও বুঝি করছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত তোমার এই আগমন—কিন্তু এখন যেন ভয় পাচ্ছি। তলিয়ে ভাবতে চাই না, সাহস হয় না; কল্পনায় দেখি, তুমি এলে, ঘণ্টা বাজালে, তোমার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে·· আমার তো বুক স্পন্দনবিহীন হয়ে গেল, কি এক আঘাতে যেন নিঃসাড় হয়ে পড়লাম। দেখা হলে আমি বোধহয় কথা বলতে পারব না। আমার অতীত বুঝি এখানে শেষ হয়ে গেল; তার ওপারে কি আছে দেখতে তো পাচ্ছিনা। আমার জীবন থেমে গেছে···

চারদিন কি এক সপ্তাহ পরে আর একখানা চিঠি পেলাম। সাময়িক বিভাগ থেকে তখনো অব্যাহতি পাইনি। বড় সংক্ষিপ্ত সে চিঠি।

বন্ধু, তুমি লা-হাভারে যে বেশীদিন থাকতে চাওনা এতে আমার সম্পূর্ণ সায় আছে। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার দীর্ঘস্থায়ী করবার আমারও ইচ্ছা নেই। এমনি কি আমরা মুখে বলতে পারি যা আমরা লিখে জানাইনি? তাই পরীক্ষার পরে তোমাকে যদি ২৮ তারিখেই পারীতে চলে আসতে হয়, তাতেও দ্বিধা কোরোনা। আবার দুঃখও কোরো না যে, মাত্র দুদিন আমাদের সঙ্গে রইলে। আমাদের গোটা জীবনটাই কি সামনে পড়ে নেই।

ছয়

প্লতিয়েঁ মাসির ওখানেই আমাদের প্রথম দেখা। হঠাৎ মনে হলো আমার পল্টনি চাকুরীটা আমাকে কেমন বেঢপ আর বেজুত করে ফেলেছে……পরে ভাবলাম, ও বোধ হয় আমার পরিবর্তন লক্ষ্যই করেছে। কিন্তু এই প্রথম দেখার মিথ্যে প্রভাবের আমাদের কাছে কি দাম? আমি তো আগেকার আলিসাকে না পেয়ে তখন ভীত, তাই ওর মুখের দিকে তাকাতেও পারিনি। না, তা নয়। সবচেয়ে বিব্রত বোধ করলাম আমাদের বাকদানের বিশ্রী ব্যাপারটায় —ওটা যেন সবাই জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলে। সবাই তখন আমাদের একা রেখে চলে যেতে ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন। আলিসা মাসি ছলাকলাহীন ব্যস্ততায় যেভাবে অন্তর্হিত হতে চাইছিলেন, তাতে আলিসা চীৎকার করে উঠলো, দেখ তুমি তো আমাদের বাধা দিচ্ছনা, আমাদের নিজেদেরই বলার মতো কোনো গোপন কথা নেই।

বাছা, সবই জানি, বুঝি। ছেলেমেয়েরা যখন বহুদিন পরে একে অপরের দেখা পায়, তখন তাদের বলার কত যে কথা থাকে তার কি ঠিক আছে!

দেখ, তুমি চলে গেলে আমরা সত্যিই বিরক্ত হব, আলিসা এমন স্বরে বললে, মনে হোলো ও যেন ক্রুদ্ধ। এ যেন আলিসার স্বরই নয়।

হেসে বললাম, মাসি সত্যি বলছি, তুমি চলে গেলে আর আমাদের একটা কথাও হবে না। সত্যিই তখন ওর সঙ্গে একা থাকতেই আমার ভয়। তারপরে প্রফুল্লতার ভান করে তিনজনেই আলাপ শুরু করলাম। টানাবোনা সাধারণ আলাপের আড়ালে

চাপা দিতে চাইলাম আমাদের এই অস্বস্তি। পরদিন আবার দেখা হবে। মামা আমাকে দুপুরে খেতে বলেছিলেন। তাই রাতে মনে খেদ না রেখেই বিদায় নিলাম। বরং অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে যে উদ্ধার পাওয়া গেল এতেই খুশি হলাম।

খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসে হাজির হলাম। দেখলাম, আলিসা তার এক বন্ধুনীর সঙ্গে কথা বলছে। তাকে বিদায় দেবার শক্তি তার নেই। আবার চলে যাবার মতো বুদ্ধি বন্ধুনীটীরও নেই। যখন ও চলে গেল, আমি অবাক হবার ভান করলাম, আলিসা কেন তাকে খেতে বললে না! দুজনে স্নায়ুর তাড়নায় ভুগছি, জাগার রাতের ক্লান্তি ও আছে। মামা এলেন। আলিসা বুঝতে পারলো, আমার চোখে তিনি যেন বড় বুড়িয়ে গেছেন। বধির হয়ে গেছেন, বহু কষ্টে শুনতে পেলেন আমার কথা। তাঁকে শোনাবার জন্যে চেঁচিয়ে কথা বললাম। কথাগুলি যেন বড় একঘেয়ে আর নির্বোধের মতো শোনালো।

যাবার পরে প্লতিয়েঁ মাসি পূর্বের ব্যবস্থা-মতো আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি নিয়ে এলেন। অর্চার-এ নিয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে, সেখান থেকে আমি আর আলিসা হেঁটে ফিরি। মধুর হবে আমাদের এই আলাপচারী ভ্রমণ।

কাল হিসেবে আবহাওয়া ছিল সেদিন গরম। যে পাহাড়ের উপর দিয়ে আমাদের পথ সেটি তখন শ্রীহীন। রোদ এসে পড়েছিল। নিষ্পত্র গাছপালা আমাদের আশ্রয় দিলে না। মাসি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় আছেন, তাঁরই সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। জোরেই চলা শুরু হলো; অস্বস্তি লাগছিল। আমার এমন মাথা ধরলো যে একটা কথা মগজ থেকে বার করতে পারলাম না; তবু মুখপাত রাখার জন্যে, অথবা কথার থেকে ভাবভঙ্গীতে বেশি কাজ হবে বলে আলিসার হাত ধরলাম। ও

হাতখানা আমার হাতে ছেড়ে দিলে। আমাদের ভাবাবেগে, চলার দ্রুতলয়ে, আর এই নীরবতার অস্বস্তিতে মিলে মুখে ছুটে এল রক্তধারা, কপালের শিরা স্পন্দিত হলো, অসুস্থ-ঔজ্জ্বল্যে ভরে গেল আলিসার কপোল। কিন্তু ভেজা নেতানো হাতের স্পর্শের অস্বস্তিতে আমাদের হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। হাত আবার ঝুলে পড়লো বিষণ্ণতায়।

বড় বেশি তাড়াতাড়ি করেই এলাম, গাড়ির আগেই চৌরাস্তার মোড়ে এসে গেলাম। গাড়ি অন্য পথে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে আসছিল; আমাদের আলাপের প্রচুর অবসর দেওয়াই তো মাসির ইচ্ছে। পথের পাশে উঁচু জায়গাটার উপর বসে পড়লাম। ঠাণ্ডা হাওয়া হঠাৎ বয়ে গেল, একেবারে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে। আমরা তো একটু আগে গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠেছিলাম। এবার চললাম গাড়ির সন্ধানে। কিন্তু সবচেয়ে আমাদের মাসি বেচারীর কাকুতি-মিনতিই তখন চরমে উঠেছে। তিনি ভেবেই রেখেছিলেন—দীর্ঘক্ষণ আলাপে আমরা খুশি। তিনি আমাদের বাগদানের কথা জিজ্ঞেস করবেন বলে আশা করে আছেন। আলিসার আর সহ্য হোল না, চোখে তার জল। বললে, ভয়ানক মাথা ধরেছে। আমরা নীরবে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরদিন যখন উঠলাম, গায়ে ব্যথা হয়েছে, সর্দি লেগেছে। এমন অসুস্থ হয়ে পড়লাম যে বিকেলের আগে বুকোলেঁদের ওখানে যাওয়া মুলতুবী রইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আলিসা সেদিনও একা ছিল না। ফেলিসি মাসির এক নাতনী মাদোলিন প্লতিয়েঁ এসেছে। আলিসার সে প্রিয়। ক'দিন ঠাকুরমার ওখানে থাকবে। আমি ঢুকতেই ও বললে, আপনি কোডে ফিরে যাবেন তো? তাহলে আমারা এক সঙ্গেই যেতে পারি।

যন্ত্র-চালিতেরমতো সম্মতি দিয়ে ফেললাম। আলিসার সঙ্গে

নিরিবিলিতে দেখা করা আর হোলো না ; কিন্তু এমন চমৎকার এই মেয়েটি, ওর উপস্থিতিতে আমাদের সাহায্যই হলো। গত-কালের অস্বস্তি আমার আর রইল না ; আমাদের তিনজনের আলাপ তর্‌তর্ করে বয়ে চললো। প্রথমে যেমন অতি নিস্ফলতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছিল, তা আর হোলনা। আলিসা আমাকে বিদায় দিতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলো। আমার মনে হোলো, কাল ভোরে যে আমি চলে যাব সেকথা ও তখনো বুঝতে পারে নি। কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবো এই প্রতিশ্রুতিতেই বিদায়ের বিষণ্ণতা কেটে গেল।

রাতে খাবার পরে কি এক অস্থিরতা আমাকে ঘিরে ধরলো। তারই তাড়নায় শহরে চলে এলাম। আর প্রায় একঘণ্টা ঘুরেও বেড়ালাম। শেষে বুকোলেঁাদের বাড়ি যাব এই স্থির হলো। গিয়ে ঘণ্টি বাজালাম। মামা আমাকে নিয়ে এলো ভিতরে। আলিসার শরীর ভাল নেই, এরই মধ্যে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ মামার সঙ্গে আলাপ করে চলে এলাম।

আমাদের এখন এমন অবস্থা, সবদিকে অনুকুল হাওয়া বইলেও আমরা নিজেরাই অশ্বস্তি স্মৃষ্টি করে বসতে পারতাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখ হলো, আলিসাও এ অনুভূতি থেকে রেহাই পায়নি। পারী ফিরেই ওর চিঠি পেলাম।

বন্ধু, এ কি শোকাবহ সাক্ষাৎকার! সত্যিই কি অপরিসীম দুঃখ! তুমি বোধ হয় অন্যের উপর দোষ চাপাতে চাইছ। অথচ মনকে তা বিশ্বাস করাতে পারছ না। এখন আমার মনে হচ্ছে—এমনি ধারাই হবে। তাই তোমার কাছে ভিক্ষা—আর যেন আমাদের দেখা না হয়!

কেন এই বিশ্রী আবহাওয়া, অপ্রীতিকর অনুভূতি, এই মানসিক পক্ষাঘাত, এই মৌনতা? আমাদের এত কথা বলার ছিল, অথচ কেন বলা হোল না? তুমি যেদিন প্রথম এলে, এই মৌন ভাবটিই আমার ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম, এ মিলিয়ে যাবে, তুমি আমাকে বলবে আশ্চর্য সব কথা। না বলে তো পারবে না।

কিন্তু আমাদের আবার অভিযান শেষ হলো একটি কথাও না বলে, আমাদের হাত ধরা পড়লো হাতের বাধনে, আবার খসেও পড়লো হতাশায় ; মনে হল, দুঃখে ব্যথায় আমার মন বুঝি অচেতন হয়ে পড়বে। তোমার হাত আমার হাত থেকে খসে পড়লো বলেই শুধু দু'খ পাইনি, আমার অনুভূতিও তখন তোমারই মতো। তোমার হাত খসে না পড়লে, আমারই পড়তো। আমার হাত তো তোমার হাতের বাধনে থেকে আরাম পাচ্ছিল না।

পরদিন—তার মানে গত কাল—সারা সকালটা তোমার আশায় বসেছিলাম পাগলের মতো। ঘরে বসে থাকতে পারছিনা এমনিই তখন অধীর। তোমার জন্যে একছত্র লিখে রেখে গেলাম, জেঠিতে আমাকে কোথায় পাবে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কেটে গেল, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমার দুঃখ তখন প্রচণ্ড। হঠাৎ মনে হল, তুমি হয়তো আমার ঘরে আমারই প্রতীক্ষায় বসে আছ। তাই ফিরে এলাম। জানতাম, বিকেলে আমার সময় হবে না। মাদোলিন আগের দিন বলেছিল, সে আসবে। তোমার সঙ্গে সকালে দেখা হবে বলেই আসতে নিষেধ করিনি। কিন্তু ওর সামনেই তো আমাদের সাক্ষাতের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলি কেটেছে। কয়েক মিনিটের জন্য এক অদ্ভুত মোহ দেখা দিয়েছিল—এমন আলাপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। সোফায় ওর পাশে বসেছিলাম, যখন কাছে এসে ঝুকে পড়ে নীচু হয়ে বিদায় চাইলে, কথা বলতে পারিনি। মনে হোলো, সব শেষ। চেতনা ফিরে পেলাম—তুমি চলে যাচ্ছ।

মাদোলিনের সঙ্গে চলে যেতেই অসম্ভব, অসহ্য হয়ে উঠলো মনের অবস্থা। বিশ্বাস করবে কি ? বেরিয়ে পড়লাম ! আবার তোমার সঙ্গে তখন কথা বলতে চাই, যা বলিনি তাই তোমাকে বলতে চাই। প্রতিয়েঁদের ওখানে ছুটে চললাম।···কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। সময় নেই, সাহস নেই···আবার, আবার ফিরে এলাম। হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে লিখতে বসলাম চিঠি—তোমাকে জানিয়ে দিতে হবে—আর তোমার কাছে আমি চিঠি লিখতে চাইনা। এই শেষ বিদায়ের চিঠি। আমার তো মনে হয় আমাদের এই চিঠির আদান প্রদান তো এক বিরাট মায়া-মরীচিকা—হায়, আমরা তো পরস্পরের কাছে এ চিঠি

লিখছি না—লিখছি নিজেদেরই কাছে। জেরোম, জেরোম! ভাবতো, আমরা কতখানি পরস্পপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি! আর সব সময়ইতো তাই ছিলাম।

চিঠিখানা ছিড়ে ফেলে দিলাম, আবার নতুন করে সেই একই কথা লিখছি। প্রিয়, আমি তো তোমাকে কম ভালবাসি নে। বরং আমার মনের এই বিক্ষোভ, এই অস্থৈর্যের ভিতরে তুমি কাছে এলে তোমার প্রতি ভালবাসা যত স্পষ্ট করে অনুভব করি, এমন তো আগে কখনো করতাম না। কিন্তু এ ভালবাসা যেমন গভীর তেমনি তো হতাশা ভরা। তুমি চলে গেলে মনে মনে বলি, আমি তোমাকে ভালবাসি—বড় ভালবাসি! আগেকার চেয়েও বুঝি গভীর আমার এই ভালোবাসা। হাঁ, তাইত এখন সন্দেহ হয়। এই বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকার আমাকে সত্য কি তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তোমারও তো সে সত্যে বিশ্বাস করা উচিত। বিদায়, আমার প্রিয় বন্ধু! ভগবান যেন তোমাকে রক্ষা করেন, পথ দেখান। তিনিই আমাদের একমাত্র সহায়।

এ চিঠিতে যে ব্যথা আছে, তা পাছে যথেষ্ট না হয়, তাই ও বুঝি পুনশ্চে সেটুকু পূরণ করে দিলে।

আমাদের ব্যাপারে একটু বুদ্ধির পরিচয় না দিতে বলে পারলাম না। যে কথা আমাদের দুজনের ভিতরেই গোপন থাকা উচিত, জুলিয়েৎ আর আবেলকে সেকথা বলে তুমি আমাকে মনে ব্যথা দিয়েছ। এই জন্যেই তোমার সন্দেহের ঢের আগে আমার মনে হয়েছিল—তোমার ভালবাসা বুদ্ধিজীবির, বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ভালবাসা।—এ এক বিশ্বাসী ভাব-কোমল মনের ধৈর্যের চমৎকার উদাহরণ।

আবেলকে এই চিঠি দেখানো হবে এই ভয়েই এই ছত্র ক'টি লেখা। ও এমন সতর্ক হল কেন—কি সন্দেহে ও এমন সজাগ হয়েছে? আমার চিঠিতে কি ও আমার বন্ধুর ভাবধারার কোনো ছায়া দেখেছে?

সত্যি কথা, আবেলের থেকে নিজেকে অনেকখানি আলাদা বলেই মনে হয়। তাই আমাদের পথ ভিন্নমুখী। আমার দুঃখের বোঝা

একা বইবার এই শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ছিল না—এই ব্যবস্থা-পত্রেরও দরকার ছিল না।

পরের তিনটে দিন পুরো কাটলো অনুনয় বিনয়—প্রার্থনায়। আলিসার চিঠির উত্তর দিতে চাইলাম। কিন্তু শুধু আমার ভয়—সুনিশ্চিত যুক্তির অবতারণা বা উদগ্র মিনতিতে, বা একটা অসঙ্গত কথায় হয় তো ক্ষতস্থানের ব্যথা আরো বেড়ে উঠবে—দুরারোগ্য হয়ে উঠবে। বিশ বারের ও বেশি, লিখতে শুরু করলাম। আমার ভালবাসা যেন জীবন—মরণ সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আজও চোখের জল না ফেলে সে-চিঠি পড়তে পারি না। চোখের জলে দাগী হয়ে আছে তারই নকলখানা। আমি এই চিঠিখানাই পাঠাব ঠিক করলাম।

আলিসা, আমার উপরে একটু করুণা কর—দুজনের উপরেই একটু দয়া মায়া দেখাও! তোমার চিঠি আমার বুকে আঘাত হানে। তোমার আশংকাকে যদি হেসে উড়িয়ে দিতে পারতাম! তোমার প্রতিটি অক্ষর আমার অনুভূতির ধন……কিন্তু তাদের উপর নিজের মালিকানা জাহির করতে ভয় হয়। যা নিছকই কলপনা তাকে কি ভয়ংকর বাস্তবরূপ দিয়েছ তুমি, আর তারই ঘনঘটায় আমাদের মাঝখানে আঁধার সৃষ্টি করে বসে আছ!

যদি তুমি ভেবে থাক, তোমার ভালবাসায় মন্দা পড়েছে……না, না, আমার এই নিষ্ঠুর ধারণা আমি এখুনি বাতিল করে দিচ্ছি, তোমার সমস্ত চিঠি তো তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়! কিন্তু তোমার এই ক্ষণিকের আশংকার মূল্য কি বলতে পার? আলিসা, যখনি তর্ক করতে যাই, আমার কথা তো তুষারীভূত হয়ে যায়, জমে যায়। শুধু শুনি আমার আত্মার ক্রন্দন। তোমাকে এত বেশি ভালবেসেছি যে আমি নাগরালি করতে পারছি না, আর যত ভাল বাসছি, তত যেন বলার কথা ফুরিয়ে আসছে। বুদ্ধিজীবির ভালবাসা!… এর উত্তর কি দেব? আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমায় ভালোবেসেছি, কি করে বুদ্ধিবৃত্তি আর আমার হৃদয়বৃদ্ধিত্তর তারতম্য বুঝবো? কিন্তু আমাদের চিঠির আদান-প্রদানে যখন তোমার এই নিষ্ঠুর নালিশের সৃষ্টি হয়েছে

আমাদের যে উত্তুঙ্গে তারা নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে বাস্তবে পতনে যখন ভীষণ আঘাত লেগেছে, তখন নিজের কাছে লিখছ এই মনে করাই তো তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার সর্বশেষ চিঠির মতো আর একখানা সহ্য করবার শক্তি তো আমার নেই—তাই, বলি, এস আমরা সাময়িকভাবে চিঠি লেখায় ইস্তফা দিই।

বাকি চিঠিটুকু ওর রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর আবেদনে ভরে উঠলো। ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চাইলাম। আগেকার সাক্ষাৎকার তো বিরোধী আবহাওয়ায় ঘটে ছিল। স্থান, কাল, পাত্র—এমন কি তার প্রস্তুতির পরিণাম আমরা চিন্তা করিনি। কিন্তু এবার তো প্রস্তুতি হবে নীরবতার মধ্য দিয়ে। ফোঁগেসমিরে বসন্তে আবার দেখা হবে—এই আমার ইচ্ছে। ঈস্টারে আমি যাব, আর ওর ইচ্ছের উপর নির্ভর করবে আমার আলাপ আর বেশি দিন থাকা।

আমি তখন সংকল্পে দৃঢ়। তাই চিঠি ডাকে দিয়েই কাজের ভিতরে ডুবে গেলাম।

*

* *

বছর শেষ হবার আগেই আবার আলিসাদের ওখানে যেতে হলো। মিস আসবার্টনের স্বাস্থ্য ক'মাস ধরে ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল। শেষে বড়দিনের চারদিন আগে তিনি মারা গেলেন। পল্টন থেকে ফেরার পর তাঁর কাছে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। তাঁকে ছেড়ে কোথাও বেশিক্ষণ থাকতাম না। তাঁর শেষ মুহূর্তেও হাজির ছিলাম। আলিসার চিঠি এল তাঁর মৃত্যুর পরে। চিঠি পেয়ে বুঝলাম, আমার দুঃখের চেয়ে আমাদের নীরবতার শপথের ওর কাছে বেশি দাম। সে লিখলে, মামা আসতে পারবেন না। শুধু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে ও আসবে। আর তাও একদিনের জন্যে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আমি আর ও তুজনেই একমাত্র শোক প্রকাশের জন্য সেখানে ছিলাম, শবাধারের পিছনেও আমরা তুজনেই চললাম। পাশাপাশি যাচ্ছিলাম, কিন্তু একরকম কথাই হোল না। গির্জায় ও আমার পাশেই বসলো। মনে হোল, ওর সস্নেহ দৃষ্টি বার বার আমার উপরে এসে পড়ছে।

বিদায়ের সময় ও বললে, তাহলে ঐ কথাই রইল। ঈস্টারের আগে নয়।

না। কিন্তু ঈস্টারে তো বটেই।……

তোমার আশায় থাকবো।

কবরখানার ফটকে এসে দাঁড়ালাম তুজনে। ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে চাইলাম। কিন্তু ও একটা গাড়ি ডেকে আমাকে বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই চেপে বসলো। চলে গেল।

আঁদ্রে জিদ্

সাত

ফোঁগেসমিরে এসে গেলাম এপ্রিলের শেষে, মামা আমাকে পিতৃস্নেহে আলিঙ্গন করে বললেন, আলিসা তোমার জন্যে বাগানে বসে আছে। প্রথমে ওকে না দেখে নিরাশ হয়েছিলাম, পর মূহূর্তেই আমি কৃতজ্ঞ হলাম। মামুলি সম্ভাষণ থেকে আমরা যাহোক রেহাই পেয়েছি।

ও ছিল বাগানের এক প্রান্তে। আমি এগিয়ে এলাম। বছরের এই সময়ে এখানকার ঝোপঝাড়-লতায় ফুল ফোটে—লাইলাক, রোয়ান, লাবার্ণাম, আজেলিয়া চারদিকে ফুটে ফুটে আছে; বহুদূর থেকে যাতে ওকে দেখতে না পাই, আর ও-ও দেখতে না পায়, আমি তাই বাগানের অন্য পথ ধরলাম। ছায়াঘন পথ, গাছপালার আড়ালে স্নিগ্ধতায় বয়ে যায় হাওয়া।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এলাম; আকাশ যেন আমার আনন্দের মতোই উষ্ণ, উজ্জ্বল। একেবারে বিশুদ্ধ পবিত্রতায় স্নিগ্ধ। অন্যপথে আসব ও সেই আশায় বসেছিল। আমি কাছে এলাম, পিছনে এসে দাঁড়ালাম। থেমে পড়লাম···সময়ও যেন থেমে যেতে পারতো আমারই সঙ্গে সঙ্গে। মনে হোল, এইতো আমার পরম লগ্ন, সুখের প্রতিশ্রুতি সে এনে দেয়—কিন্তু সুখ তো এর কাছে লাগে না।

ওর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বো বলে ঠিক করলাম। এক পা বাড়াতেই ও টের পেল। হঠাৎ উঠে পড়লো; ছুঁচের কাজ করছিল সেটা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। আমার দিকে বাহু বাড়িয়ে দিলে। আমার কাঁধে রাখলো ওর হাত। কয়েক মূহূর্ত এমনিভাবেই কেটে গেল। তেমনি প্রসারিত বাহু, মুখে তেমনি হাসি, আমার দিকে

ঝুঁকে পড়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মুখে কথা নেই। শুভ্র সজ্জায় ও সজ্জিত। ওর গম্ভীর মুখে যেন ছেলেবেলার সেই হাসি দেখতে পেলাম।

চেঁচিয়ে উঠলাম, আলিসা শোন, আমার হাতে মাত্র বারদিন সময় আছে। তুমি যে ক'দিন বলবে, তার একদিনও বেশি থাকব না। এস আমরা একটা এমন ইঙ্গিত ঠিক করে নিই—যাতে বোঝাবে কালই ফোঁগেসমির ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি তারপর দিনই কিছুমাত্র দুঃখ বা অভিযোগ না করে চলে যাব। কি রাজি তো?

আমি কি বলবো না বলবো সে সম্পর্কে তৈরী ছিলাম না, তাই বেশ সহজভাবেই কথা বলে গেলাম। ও একটু ভাবলে, তারপর বললে।

যেদিন আমি তোমার দেওয়া সেই ক্রুশখানা পরে আসব না রাতের ভোজে—বুঝলে?

আর সেইদিনই হবে আমার শেষ রাত।

কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জল, একটু দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে চলে যেতে পারবে?

বিদায় না নিয়েই চলে যাব। আগের দিন রাতে যেমন ব্যবহার করবো, পরদিন রাতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এমন সহজ হবে সে বিদায়, তুমি অবাক হয়ে যাবে। আমি ইঙ্গিত বুঝেছি কিনা তখন বুঝতে পারবে। পরদিন ভোরে যখন আমার খোঁজ করবে, আমি তো তখন থাকব না।

আমি তো পরদিন ভোরে তোমার খোঁজ করবো না।

ও হাত বাড়িয়ে দিলে, আমি ঠোঁটের উপর তুলে নিলাম, বললাম,

কিন্তু সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যা আসার আগে পর্য্যন্ত সে যে আসন্ন হয়ে আসছে, সে ইঙ্গিত করতেও পারবে না।

আঁদ্রে জিদ্

আর তুমিও পারবেনা বিদায়ের কথা বলতে।

এই ভাব-গম্ভীর সাক্ষাৎকারে যে অস্বস্তি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিল, এবার তা দূর করা দরকার।

বলে চললাম, আমি ভাবছি, তোমার সঙ্গে এই কটা দিন অন্য দিনগুলির মতোই হয়ে উঠুক না। তার মানে কি জানো, আমরা যেন ওদের বিশেষ দিন বলে মনে না করি···তারপরে···

ও হাসলো। আবার বললাম,

এমন কি কিছু নেই যা আমরা দুজনে করতে পারি না?

বাগানের কাজে আমরা আগে আনন্দ পেতাম। সম্প্রতি পুরানো মালির বদলে এসেছে এক আনাড়ি মালি। বাগানে অনেক কাজ দুমাস ধরে অবহেলায় পড়ে আছে। কতকগুলি গোলাপ গাছ ভাল ছাঁটাই হয় নি, কতকগুলি সতেজ গাছপালার আশেপাশে বাধা সৃষ্টি করেছে মরা গাছপালা, কতগুলি বেয়ে-চলা লতা উপযুক্ত অবলম্বনের অভাবে মাটিতে লতিয়ে চলেছে; আবার অন্যগুলো তো জংলী গাছপালায় রুদ্ধশ্বাস। এগুলি আমরাই পুঁতেছিলাম, কলম করে ছিলাম। আমাদের লালিত-পালিত শিশুদের চিনতে পারলাম। ওদের উপর নজর দিতে গিয়ে আমাদের অনেকখানি সময় কেটে গেল। প্রথম তিনদিন অনেক কথাই বলা হোল, কিন্তু ভারী ওজনের কথা তার মধ্যে একটিও রইল না। আমরা যখন নীরব হয়েও রইলাম, আমাদের নীরবতা দুঃসহ হয়ে উঠল না।

আবার দুজনে দুজনকে পেলাম এমনি করে। এই ঘনিষ্ঠতা-টুকুই আমি চেয়েছিলাম, চাইনি বিস্তৃত ব্যখ্যা। আমাদের বিচ্ছেদের স্মৃতিটুকু তখন মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর সত্তার যে-ভীতি আমার অনুভূতি জুড়ে ছিল, আর আমার আত্মার যে-উদ্বেগ ওর ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল—তা যেন আস্তে আস্তে কমে এল। গত

হেমন্তের সেই বিষাদময় সাক্ষাৎকারের সময় যেমনটি দেখেছিলাম, মনে হল সে-আলিসা আর নেই। সে তখন অনেক তরুণ—অনেক সুন্দর। তখনো তাকে চুমু খাইনি। প্রতি সন্ধ্যায় দেখতাম ঝকমক করে উঠছে ওর বডিসের উপর সেই ক্রুশখানি, সোনার সুতলী হারের সঙ্গে ও গলায় পরেছে সেটি। আশা জেগে উঠতো বুকে— বিশ্বাসই সে জাগাত। কি বললাম, আশা? না, আশা নয়, তখন আমি একে ধ্রুব বলেই মনে করছি। মনে হোত, আলিসারও যেন সেই একই অনুভূতি। আমার নিজের মন তখন সন্দেহহীন, তাই তো ওর মনের সন্দেহকে আমল দিই নি। ধীরে ধীরে আমাদের সাহস বেড়ে চললো, আলাপেও চারিয়ে পড়লো সাহস।

সেদিন ভোরে, হাওয়া যখন হাসি আর আবেগে উচ্ছল, আমাদের মন যখন দল মেলছে ফুলেরই মতো—ডেকে বললাম, আলিসা, এখন তো জুলিয়েৎ সুখী···আমাদের কি···

ধীরে ধীরে বললাম, চোখ ওর উপরে স্থির হয়ে আছে; হঠাৎ ও ম্লান হয়ে গেল। কি সে ম্লানিমা—আমি তো কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

আমার দিকে চোখ না ফিরিয়েই ও বললে, প্রিয়, তোমার সঙ্গে থাকলে মন খুশি হয়ে ওঠে, এমন বুঝি আর কখনো হয় না···কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো, আমাদের তো সুখের জন্য জন্ম হয়নি।

সুখ ছাড়া আত্মা কি চায়? আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ও ফিসফিসিয়ে বললে,

আত্মা চায় পবিত্রতা। এমন মৃদু ওর স্বর, শুনতে বুঝি পেলাম না, আঁচ করে নিলাম।

আমার সমস্ত সুখ পাখা মেলে দিয়ে উড়ে গেল আকাশে। বুকের খাঁচা থেকে উড়ে গেল।

ওর হাঁটুর উপরে মাথা রেখে শিশুর মতো কেঁদে কেঁদে বললাম,

কিন্তু এতো দুঃখের ক্রন্দন নয়, ভালবাসার। তোমাকে ছাড়া তা তো পাব না। তোমাকে ছাড়া তো পাব না।

আর আর দিনের মতো সে দিনটিও চলে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় আলিসা সেই ক্রুশখানা ছাড়াই এসে দেখা দিল। কথা রাখলাম, পরদিন ভোরেই চলে এলাম।

পরদিন পেলাম এক অদ্ভুত চিঠি। সে চিঠি তুলে দিলাম। সেকস্‌পিয়ারের ক'টি ছত্র তার শিরোনামার বাণী।

আবার সেই সুর,—

নিঃশেষ হয়ে এল, মুমূর্ষু তার ছন্দধারা
আহা আমার কানে তো ভেসে এল মধুর ধ্বনি হয়ে।
ভায়োলেট ফুলে ছেয়ে গেছে ধরাতল, তার উপর দিয়ে
বয়ে বয়ে গেল—
চুরি করে নিলে, বিলিয়ে দিলে সুগন্ধি। থাক্ আর নয়,
আগেকার মাধুরিমা তো ওর আর নেই।

হাঁ, নিজের অজান্তেই সকালবেলা বার বার তোমাকে খুঁজে বেড়ালাম। তুমি চলে গেছ বিশ্বাস হোল না। প্রতিশ্রুতি পালন করেছ বলে তোমার উপর রাগ হোল। প্রথম ভাবলাম ঠাট্টা করছ। ঝোপের আড়াল থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে। না, না! সত্যিই চলে গেছ। তার জন্যে ধন্যবাদ-ধন্যবাদ প্রিয় তোমাকে!

সারাদিন কত ভাবনা মনে হানা দিয়ে দিয়ে গেল। সেগুলি তোমাকে জানাতে চাই। ভয় হয়, না জানালে পরে হয়তো তোমার প্রতি কর্তব্য করতে পারিনি বলেই মনে হবে—হয়তো তখন তোমার ভর্ৎসনার পাত্রী হয়েই উঠব।

তুমি যখন ফোঁগেসমিরে এলে, প্রথমে অবাক লাগলো তারপরে অস্থির হয়ে উঠলাম তুমি আসায় আমার সত্তা যেন এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরে উঠতো। তুমি বলেছিলে, এ এমন তৃপ্তি, আর কিছু তো আমি চাই না! হায়, সেই তৃপ্তিই তো আমার অস্বস্তি নিয়ে এল।

বন্ধু, ভয় হয় তুমি পাছে আমাকে ভুল বুঝে না বস। আমার আত্মার এই

উদ্দাম অনুভূতির প্রকাশকে তুমি সূক্ষ্ম মনোবিকলন না ভেবে বস এই আমার ভয়।

মনে আছে, তুমি আমায় বলেছিলে—'যদি ওতে মন না ওঠে, ও তো সুখ নয়? আমি কি উত্তর দেব ভেবে পাইনি। না, জেরোম, এখন তো বুঝি আমাদের পক্ষে সে তো যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট হতে পারে না, নইলে এই যে মধুর তৃপ্তি—একে তো আমি সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। আমরা কি গত হেমন্তে বুঝিনি—কি দুঃখে সে ছেয়ে ফেলেছিল আমাদের?…

সত্যিকার সুখ! ভগবান না করুন, আমরা তো সে সুখের জন্য জন্মাইনি। আমাদের……

আমাদের চিঠিপত্রে গত হেমন্তের সাক্ষাৎকার মাটি হয়ে যায়, এবারও তাই হোল। তুমি কাল ছিলে, এই স্মৃতিই আমার আজকের চিঠির মোহটুকু কেড়ে নিলে। তোমাকে চিঠি লিখে যে আনন্দ পেতাম, কোথায় গেল সে আনন্দ! পরস্পরকে চিঠি লিখে, পরস্পরের সঙ্গে থেকে থেকে—আমাদের প্রেম যে বিশুদ্ধ আনন্দের আশা করে, সেই আনন্দ আমরা ফুরিয়ে ফেলেছি হারিয়ে ফেলেছি। তাই এখন আমি নিজেকে অজান্তেই দ্বাদশতম রজনীর (সেকস্‌পিয়ারের নাটক) অরসিনোর মতোই বলে উঠি, থাক, আর নয়, আগেকার মাধুরিমা তো আর নেই।

হে বন্ধু বিদায়! তুমি কি কখনো জানবে, বুঝবে, আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি।……জীবনের শেষ দিন অবধি আমি একান্ত তোমারই।

ধর্মের বিরুদ্ধে আমি তো অসহায়। বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করে, মন টানে—কেননা আমি ভালবাসা থেকে আলাদা করে তাকে দেখিনা। আলিসার চিঠি আমাকে অনুপ্রেরণায় মাতাল করে তুললো। ধর্মের পথে চললাম ওরই জন্যে। ভাবলাম, যে পথ উর্ধগামী, সেই তো নিয়ে যাবে ওর কাছে, পৌঁছে দেবে। পৃথিবী এত সংকীর্ণ হয়ে যাবে না যে, শুধু ও আর আমিই থাকবো। হায়, আমি তো ওর এই ছলনা বুঝতে পারিনি—একবার মনেও ভাবিনি যে সে-উত্তুঙ্গে শুধু এক জনেরই ঠাঁই হবে। অন্যথায় ও আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।

আঁদ্রে জিদ্‌

দীর্ঘ উত্তর দিলাম। শুধু একটা অনুচ্ছেদই তার মনে আছে। সেইটেই বুঝি ছিল সবচেয়ে সুস্পষ্ট।

লিখলাম, প্রায়ই মনে হয়, আমার ভালবাসা যেন আমার নিজেরই উত্তমাঙ্গ। আমার সমস্ত ধর্ম সেখানে যেন সংলগ্ন হয়ে আছে; আমাকে সে আমার স্তরের উর্ধে নিয়ে যায়, তা ছাড়া আমি তো সাধারণী স্তরে নেমে যেতাম। তোমার নাগাল পাব এই আশায় সবচেয়ে দুর্গম পথই আমার কাছে হবে শ্রেষ্ঠ পথ।

বন্ধু, পবিত্রতা নিজের বাছাই-করা জিনিষ নয়—পছন্দ নয়, এ এক বাধ্যতা। (এই কথাটা তিনবার ওর চিঠিতে দাগানো ছিল) তোমাকে আমি যা ভেবেছি তাই যদি হও, তুমি তো এই বাধ্যতা এড়িয়ে চলতে পারবে না।

এই সবটুকু। আমি বুঝলাম, বা আমার আশংকাই হোল যে, আমাদের চিঠিপত্রের পালা এইখানেই সাঙ্গ। এখানে সুচতুর পরামর্শ বা দৃঢ়সংকল্প—কোনটাই খাটবে না।

আবার লিখলাম দীর্ঘ—ভাব-মেদুর-পত্র। আমার তৃতীয় পত্রের পরে পেলাম এই ছত্র ক'টি ঃ

বন্ধু আমার,

মনে কোরো না, তোমার কাছে চিঠি লিখব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। শুধু চিঠি লিখতে আর ভাল লাগে না। তবু, তোমার চিঠি এখনো আমাকে আনন্দ দেয়! কিন্তু তোমার ভাবনার অনেকখানি জুড়ে আছি বলে নিজেকে ভৎর্সনা করি।

গ্রীষ্ম বেশী দূরে নয়। আমার প্রস্তাব, কিছু দিনের জন্যে চিঠিপত্র বন্ধ করে দেওয়া যাক না। তুমি সেপ্টম্বরে কোন সময়ে এসে কদিন আমাদের এখানে থাক। কি, রাজি তো? যদি রাজি থাক, উত্তর দেবার দরকার নেই। তোমার নীরবতাই হবে সম্মতির প্রতীক। আশা করি উত্তর দেবে না।

উত্তর দিলাম না, এই নীরবতাই আমার শেষ পরীক্ষা বলে মনে হোল। ক'মাস কাজ করে, ক' সপ্তাহ বেড়িয়ে চলে এলাম

ফোঁগেসমিরে। তখন আমার মন শান্ত, বুক বিশ্বাসে দীপ্ত।

কি করে সরল সহজ ভাবে জানাব সে কথা, আমি নিজেই তো প্রথমে বুঝতে পারিনি? তখন থেকে যে দুঃখ আমার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করেছিল, তা ছাড়া কোন্ ছবিই বা আমি আঁকবো? যে ভালবাসা আমার ভিতরে তখনো স্পন্দিত, কৃত্রিম আবরণে ঢাকা ছিল তাকে চিনতে না পারার ব্যর্থতা যদি আজও ক্ষমা করতে না পারি, সেদিন তো আরো পারি নি। প্রথমে শুধু ঐ কৃত্রিমতাটাই চোখে পড়ে ছিল। তাই বন্ধুকে আমি নালিশ জানালাম....না! আলিসা, তখনো আমি তোমাকে অভিযুক্ত করিনি, শুধু হতাশ হয়ে কেঁদেছি—তোমাকে আমি আর চিনতে পারিনা। এখন তো সেই নীরব ছলনার ভিতর দিয়ে তোমার ভালবাসার শক্তি অনুভব করতে পারি, আর তারই নিষ্ঠুর পীড়নে তোমাকে আরো ভালবাসি—তুমি তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছ—তবু ভালবাসি।

ঘৃণা? উদাসীনতা? না; যাকে পরাস্ত করা যায় না, সংগ্রাম চলে না যার বিরুদ্ধে। কখনো বা দ্বিধা হোত মনে, আমার এই দুঃখ কি আমি আবিষ্কার করিনি। এর কারণ তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আর আলিসার না বোঝার ভান তো আরো ছলাকলা-ভরা। কিন্তু কিসের জন্য অভিযোগ? ওর স্বাগত সম্ভাষণ তো আগেকার চেয়েও আনন্দে উচ্ছল; কখনো এমন সহৃদয়ও হয়ে ওঠেনি, এমন অভিনিবেশ ওর দেখিনি। প্রথম দিন তো অভিভূত হয়েই গেলাম। নতুন ছাঁদে ও চুল আঁচড়ে ছিল, তাতে কি এল গেল! চুলকে পিছনে উলটে দিয়ে ছিল। ওর মুখের রেখায় রেখায় তখন কঠোরতা—সত্যিকার অভিব্যক্তি বদলে গেছে,—একটা বেমানান পোষাক, রং তার ম্লান, বুনোনিও বিশ্রী—ওর ছন্দ-সুন্দর তনুকে বিশ্রী বেঢপ করে তুলেছিল—কিন্তু তাতে কি এল গেল?...অন্ধ আমি, ভাবলাম, এমন কিছু তো নেই যাকে কাল শোধরানো চলবে না, হয় ও নিজের ইচ্ছায়ই

শোধরাবে, নয়তো আমার অনুরোধে। আমি কিন্তু ওর আদরে, মনোযোগে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম—আমাদের তো এ অভ্যেস ছিল না। এতে আমি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ পেলাম না, এ যেন সুচিন্তিত ব্যাপার। কিন্তু একথা বলা হোল না। ভালবাসার খাতিরে নয়, ভদ্রতাবোধে।

সেদিন সন্ধ্যায় বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। অবাক হয়ে গেলাম। পিয়ানোটা আগেকার জায়গায় নেই। আলিসা আমার খেদোক্তির উত্তর দিলে শান্ত স্বরে,

ওটা তো মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে।

মামা ভর্ৎসনার সুরে বললেন—কড়াই শোনালো তাঁর স্বর, বাছা, তোমাকে তো বলেছিলাম, এতদিন পর্যন্ত যখন চলে ছিল, জেরোম চলে যাবার পরে মেরামত করতে দিলেই হোত। তোমার তাড়াতাড়িতে আমাদের আনন্দের কম্‌তি হোল।

ও আরক্ত মুখখানা একপাশে ফিরিয়ে নিয়ে বললে, বাবা, সত্যি এমন বেসুরো বাজছিল যে, জেরোমের মতো গুণীও ওটার থেকে কোনো সুরই বার করতে পারত না।

মামা বললেন, তুমি যখন বাজাতে, তেমন তো খারাপ লাগতো না।

কয়েক মুহূর্ত আলো-আঁধারির ভিতরে ও ডুবে রইল, চেয়ারের ঢাকনির মাপ নিতে লাগলো, তারপরে হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বহুক্ষণ পরে মামার ওষুধ নিয়ে এল। সন্ধ্যায় এটা খাওয়া তাঁর নিয়ম।

পরদিনও পোষাক বদলালে না, চুল রইল তেমনি টান্ করে বাঁধা। বাড়ীর সামনে একখানা বেঞ্চিতে বাপের পাশে বসে সে ছুঁচের কাজে মেতে রইল। গত সন্ধ্যায়ও সে এইটে নিয়েই ব্যস্ত

ছিল। ওর পাশে একটা মস্ত টুকরিতে মোজাগুলি রয়েছে। কদিন পরে দেখা গেল তোয়ালে আর চাদর। কাজে সে বিভোর। এমন সে বিভোরতা যে ভাব-ব্যঞ্জনার শেষ ঝলক যেন ওর ঠোঁট বা চোখ থেকে মিলিয়ে গেছে। ওর মুখ থেকে সব কালিমা মুছে গেছে দেখে ভয় পেলাম। আমি তো চিনতেই পারিনি। বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ও বুঝি দেখেও দেখল না। আমি শেষে ডাকলাম, আলিসা!

মাথা তুলে তাকাল, কি?

আমার কথা শুনবে? তোমার মন তো এখন আমার থেকে বহু বহু দূরে।

না, এই তো মন আমার এখানে, কিন্তু জান তো এই রিফু করার কাজে বড় বেশি নজর দিতে হয়।

তুমি যখন রিফু করবে, আমি কি তোমাকে কিছু পড়ে শোনাব?

কিন্তু আমার ভয় কি জান, হয়তো ভাল করে শোনা হবে না।

এমন কাজ করতে বসেছ কেন?

কাউকে না কাউকে তো করতেই হবে।

অনেক গরীব মেয়ে আছে সামান্য পয়সার জন্যে তারা ও কাজ করতে পেলে বর্তে যায়। শুধু অর্থনীতির খাতিরেই অমন একটা একঘেয়ে কাজ নিয়ে তুমি বসনি?

ও আমাকে জানিয়ে দিলে, অন্য কোনো কাজ ওর এত পছন্দ নয়। আর বহুদিন ধরে এই কাজই ও করে আসছে। অন্য কিছু করবার আর অভ্যাস নেই। বলতে বলতে ও হাসলো।

মিষ্টি ওর স্বর, এমন তো কখনো শুনি নি। অথচ ও তো আমাকে আঘাতই করছে। ওর মুখ দেখে তো মনে হয়, ও যেন বলছে, আমি সত্যি কথাই বলছি। তুমি অমন মুষড়ে পড়লে কেন?

আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রতিবাদ ঠোঁটে ফুটে উঠল না—এমন কি ঠোঁট অবধি এসে পৌঁছল না, শুধু আমার শ্বাসরুদ্ধ করে দিল।

দু-একদিন পরের কথা। আমরা গোলাপ তুলছিলাম বাগানে। ও আমাকে ডাকলে, ফুলগুলো নিয়ে যেতে হবে ওর ঘরে। এ-বছরে তো ওর ঘরে আর যাইনি। আশা যেন পাখা দুলিয়ে গেল মনে। আমার এই বিষাদের জন্য তো তখন নিজেকেই দুষছিলাম; ওর কাছ থেকে একটি মিষ্টি কথা শুনলে, মন বুঝি আরাম হয়ে যাবে।

এই ঘরে যখনি ঢুকেছি, আবেগ-চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার মন। কি দিয়ে যে এমন সুরময় শান্তি রচনা হয়েছে, তা কি করে বলবো! সেই শান্তি চারদিকে ঝরে পড়ছে। আর তারই মধ্যে বিরাজ করছে আলিসা। জানালার পর্দা আর খাটের মশারী ঘরে রচনা করেছে মোহ-নীল ছায়া। ঝকঝকে আবলুষ কাঠের আসবাবপত্র, সুমিত সুশৃঙ্খলায় সাজানো, কোথাও নেই একটি দাগ। আর আছে নীরবতা ওর পবিত্রতা আর ম্লান সৌন্দর্যেরই যেন তারা প্রতীক।

অবাক হয়ে দেখলাম, ইতালী থেকে যে দুখানি বড় বড় ফোটো এনে দিয়েছিলাম, এতদিন ওর বিছানার পাশেই টাঙানো ছিল, এখন আর নেই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, সেগুলির কি হোল, এমন সময় কাছের বইয়ের তাকে নজর পড়লো। ওখানে বিছানায় শুয়ে পড়বার মতো বইগুলো ও রাখে। এই সংগ্রহটি আস্তে আস্তে রচিত। আমার নিজের আর অন্যের দেওয়া বইয়ে এর সৃষ্টি। এবার দেখলাম, সে-বইগুলি নেই। ওখানে আছে ছোট ছোট অনামী লেখকের রচনা। তাতে করুণায় গদগদ অশ্লীল উচ্ছ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নেই। ওর তো ওদের উপর ঘৃণাই ছিল। হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখি—আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসছে।

ও তখুনি বললে, মাপ করগো, তোমার মুখখানা দেখে না হেসে

পারিনে। তুমি যখন বইয়ের তাক দেখছিলে, তখন তো হঠাৎ তোমার মুখের ভাব লক্ষ্য করলাম।

আমি তো হাসতে রাজি নই।

আলিসা, আজকাল তুমি এই বই পড় ?

হাঁ, পড়ি। অবাক হলে কেন ?

পুষ্টিকর জিনিসে যার রুচি, সে তো এগুলো পড়লে বিরক্তই হবে।

ও বললে, তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। এরা দীনহীন আত্মা, সহজ ভাবেই আমার সঙ্গে কথা কয়—নিজেদের মনের কথা উজাড় করে দেয়। ওদের সাহচর্যই আমার সুখ। আমি আগেই জানি, ওরা ভাষার কারিকুরির ফাঁদ পাতবে না। পড়তে পড়তে আমি প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবো না।

এখন কি আর এ ছাড়া বই পড় না ?

একরকম তাই। ক'মাস ধরে তো এই-ই পড়ছি। কিন্তু এখন আর পড়াশুনায় বেশি সময় দিতে পারি না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, তুমি আমাকে যে সব বিখ্যাত লেখকের রচনা তারিফ করতে শিখিয়েছিলে, এই সেদিন তাঁদের একজনের বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলাম—আমার যেন বাইবেলের সেই লোকটির মতো দশা হোল—সেই যে—যে নিজে লম্বায় বড় হবার জন্য চেষ্টা করেছিল।

কে সেই বিখ্যাত লেখক, যাঁর বই পড়ে এমন অদ্ভুত মনোভাব সৃষ্টি হোল ?

না—উনি এ মনোভাব সৃষ্টি করেন নি। পড়তে গিয়ে মনে হোল। তিনি পাস্কাল। হয়তো এমন একখানা পাতা খুলে বসেছিলাম—যেখানায় তেমন কিছু নেই।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। একঘেয়ে, স্পষ্ট ওর স্বর—যেন পড়া মুখস্ত করছে, ফুলের গোছা থেকে একবারও চোখ তুললে না।

সাজাচ্ছে আর এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমার ভাবভঙ্গী দেখে ফুল সাজানো রেখে তেমনি স্বরেই বললে,

অদ্ভুত বলার ধরন—কি চেষ্টা—অথচ প্রতিপাদ্য কিছুই নেই। ও বললে, আমি তো মাঝে মাঝে ভাবি, পাস্কালের বিষণ্ণতার কি বিশ্বাস থেকে উৎপত্তি —না সন্দেহ থেকে? যাঁর বিশ্বাস দৃঢ় তাঁর তো চোখের জলের বন্যা কম বইবে, আর শিহরণও হবে কম।

ঐ শিহরণ, ঐ চোখের জলই তো ওঁর বলায় অমন মোহ এনে দিয়েছে। আমি পাল্‌টা জবাব দিতেই চেষ্টা করলাম—কিন্তু সে উত্তেজনা তো ফুটে উঠলো না। ওর কথায় তেমন কিছু তো পেলাম না—যার জন্যে আলিসাকে আমি ভালবাসতাম। ওর কথা যেমন যেমন মনে আছে লিখে যাচ্ছি—যুক্তি বা শিল্পসৃষ্টির খাতিরে একটুও বদলাচ্ছি না।

ও বললে, উনি যদি জীবন থেকে আনন্দ শুষে না নিতেন, তাহলে নিক্তিতে এরই ওজনটা বেশী হোত……

ওর অদ্ভুত কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, কিসের চেয়ে বেশী হোত?

ওর ঐ অনিশ্চিত সুখের সংকেতের চেয়ে।

তাহলে তুমি আর ওতে বিশ্বাসী নও? চীৎকার করে উঠলাম।

সে কথা নয়। ও উত্তর দিলে। ঐ সুখের সংকেত থাক না অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে—তাহলে দর কষাকষির সমস্ত পালা বোধহয় সাঙ্গ হবে। ভগবানকে যে ভালবাসে, সে তো তাঁর নিজের প্রাণের স্বতস্ফূর্ত আবেগেই ভালবাসে—লাভের আশায় তো নয়।

আর সেই জন্যেই পাস্কালের মনে এসেছে গোপন অবিশ্বাস? উনি তারই আশ্রয় নিয়েছেন।

অবিশ্বাস নয়, অন্য আর-এক মতবাদ, ও হাসলো। আমি ওই মতবাদ নিয়ে কি করবো? এখানকার মানুষরা তো মতবাদ নিয়ে

মাথা ঘামায় না। ঘাস যেমন বাতাসে লুটিয়ে পড়ে, কোন তার ছল চাতুরী উদ্বেগ থাকেনা—তেমনি তারাও ভগবানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। নিজেদের তুচ্ছ বলেই মনে করে—শুধু জানে তাদের একমাত্র মূল্য ভগবানের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আলিসা, তোমার ডানা দুখানা তুমি ছিঁড়ে ফেলে দিলে!

ওর তেমনি সহজ, স্বাভাবিক স্বর, আমার চীৎকার যেন বড় বেখাপ্পাই লাগলো।

আবার হাসলো, মাথা নাড়লো, পাস্কালের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে পেলাম একটি কথা?

কি পেলে?

খৃষ্টের সেই বাণী—যে নিজের জীবন বাঁচাতে চাইবে সে তো হারাবে সে জীবন। ও আবার হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, সত্যি, আর পাস্কালকে বুঝতে পারি না। এমন দীনহীন সহবাসে থাকলে, মনীষীর মহত্ব তো তখন মানুষের নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দেয়—তাকে ক্লান্ত করে ফেলে।

আমি কি এর উত্তর দিইনি? দিয়েছিলাম। বললাম, যদি তোমার সঙ্গে বসে আমাকে যত ধর্মের বাণী পড়তে হয়—

ও বাধা দিলে, কিন্তু তুমি পড়লে আমি দুঃখিতই হব। তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত। ওর চেয়ে ঢের বড় কিছু তুমি করবে।

সহজ ভাবেই ও কথা বলছিল। একবারও ভাবেনি যে বিচ্ছেদের আভাসে আমার বুকখানা দীর্ণ হয়ে যাবে। মাথা তখন জ্বলছে; তবু কথা বলে যেতে চাইলাম; কাঁদতেও ইচ্ছা হোল; হয়তো আমার চোখের জলে ও পরাজয় মেনে নিত। কিন্তু কথাটি না বলে হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলাম। ও ফুল সাজাতে লাগলো। তাকিয়ে

দেখলো না—না-দেখার ভাণ করেই বুঝি রইল আমার এই দুঃসহ ব্যথা।......

এমনি সময় ঘন্টি বেজে উঠলো

ও বললে, খাবার ঘন্টি পড়লো। আমি তো এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিতে পারব না। তোমাকে এখন চলে যেতে হবে। এ যেন খেলা, অভিসার!—এমনি ভাবেই ও বললে, অন্য সময় কথা হবে।

কথা আর হয়নি। আলিসা শুধু আমাকে এড়িয়েই চলছিল, আমাকে যে এড়িয়ে চলছে, তা ভাবে-ভঙ্গীতে স্পষ্ট জানায় নি; তবে যে কোনো তুচ্ছ কাজও তখন ওর কাছে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পালা কখন আসবে তারই প্রতীক্ষায় আমি তখন বসে আছি। ঘর-সংসারের অবিরাম ঝামেলা আর খামার বাড়ির ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি, চাষীদের তত্ত্বাবধান, গরীব দুঃখীদের তত্ত্বতালাসের পরেই আসতো আমার পালা। ওতো এসব ব্যাপারে ডুবে গিয়েছিল। যেটুকু সময় থাকতো সেটুকু ছিল আমার। কিন্তু থাকতোই বড় কম। কখনো ওকে এসে ব্যস্ত ছাড়া দেখিনি—কিন্তু ব্যস্ত তো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে। ওর পিছনে ছুটে ছুটে যখন আশা ছেড়ে দিলাম, আমার মনে হোল, আমি অধিকারচ্যুত হয়েছি। ওর সামান্য কথায় তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। আলিসা আমাকে যতটুকু সময় দিত, তখন চলতো একঘেয়ে টানা বোনা কথার বুনোনি। যেন শিশুকে খেলা দিচ্ছে। ও আমার পাশ দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে যেত, অন্যমনস্ক হয়ে থাকতো, আবার হাসতো। মনে হোত, ও যেন আগেকার চেয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। আবার মনে হোত, ওর হাসিতে যেন দ্বন্দ্বের আহ্বান, নয়তো আছে বিদ্রূপ—আমার কামনা এড়িয়ে চলে ও আনন্দ পায় ...ওকে ভর্ৎসনা না করে নিজেকেই দুষতাম। ওর কাছ থেকে

কি পাব তা তখন জানি না, ওকে কি করে ভর্ৎসনা করবো তার ভাষাও খুঁজে পাইনি।

সুখের আশাভরা দিনগুলি আমার কেটে গেল। স্তব্ধ হয়ে দেখলাম, উড়ে গেল দিন, কিন্তু তাদের রাখতে তো আর চাইলাম না—দিনের সংখ্যা বৃদ্ধিও তখন আর আমার কাম্য নয়। আমার দুঃখ তো তারা বাড়িয়েই দিচ্ছে। চলে আসার দুদিন আগে আলিসা খাতের কাছের ঐ বেঞ্চিটায় এসে বসলো আমার পাশে। উজ্জ্বল হৈমন্তী সন্ধ্যা ঃ নির্মেঘ দিগন্ত। পটভূমি আকাশের নীলে স্পষ্ট, উজ্জ্বল। অন্য আবহাওয়ার স্মৃতিও নেই। আমি কান্না চেপে রাখতে পারলাম না। আমার দুঃখ প্রকাশ পেল কথায়। যে সুখ হারিয়েছি তারই কথা বললাম।

ও তখুনি বলে উঠলো, আমি কি করবো বন্ধু? তুমি যে এক প্রেতের প্রেমে পড়েছ।

না, না, প্রেত নয়।

তাহলে তোমার কল্পনার মানুষ।

আলিসা, আমি তো কল্পনা করতে বসিনি। সে ছিল একদিন আমার বন্ধু। আমি তার কাছে এলাম। আলিসা, আলিসা, তোমাকেই তো ভাল বেসেছিলাম। কি করেছ নিজেকে নিয়ে? কি হয়ে উঠলে তুমি?

কয়েক মুহূর্ত ও চুপ করে রইল। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ছিল আনত হয়ে। তার পরে বললে,

জেরোম, একথা কি স্বীকার করতে পার না, তুমি আর আমাকে তেমন করে ভালবাস না?

সে সত্যি কথা নয়—তাই স্বীকার করিনে! সত্যি নয়! ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। তেমন করে ভাল আর তো তোমাকে বাসিনি!

আঁদ্রে জিদ্

তুমি ভালবাস—আবার অনুতাপ কর। ও হাসতে চেষ্টা করলো, কাঁধে তুললো ঝাঁকুনি।

আমার ভালবাসাকে তো আমি অতীতের কোটরে বন্দী করে রাখতে পারি না।

আমার পায়ের নীচের মাটি যেন দুভাগ হয়ে গেল। আঁকড়ে ধরবার কিছু নেই। ও বললে, এ ভালবাসা তো অন্য সব কিছুর মতোই মিলিয়ে যাবে।

আমার ভালবাসা শুধু আমার সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হবে—তার আগে নয়। ধীরে ধীরে কমে যাবে। যে-আলিসাকে এখনো তুমি ভালবাস বলে মনে কর—সে তো আসলে তোমার স্মৃতি হয়ে আছে। এমন দিন আসবে যখন শুধু মনে পড়বে—একদিন তাকে ভালবেসেছিলে।

তুমি এমন করে কথা বলছো, যেন আর কেউ আমার মনে তোমার স্থান জুড়ে বসবে, নয়তো আমার মনই আর ভালবাসতে পারবে না। আমাকে যে একদিন ভালবাসতে, সে কথা কি আর তোমার মনে নেই? তোমার তো এখন ব্যথা দিয়েই আনন্দ।

ওর শুকনো ঠোঁট দুখানি কেঁপে কেঁপে উঠলো, বোঝা যায় না এমনি স্বরে ফিসফিসিয়ে বললো, না, না, আলিসা তো বদলায় নি।

ওর হাত ধরে বললাম, তাহলে, কিছুই বদলায় নি।

ও দৃঢ় স্বরে বললে, একটা কথায়ই তো সব পরিষ্কার হয়ে যায়। ও কথা বলছো না কেন?

কি কথা?

আমি বুড়ি হয়ে গেছি।

চুপ!

আঁদ্রে জিদ্

আমি প্রতিবাদ জানালাম—আমি নিজেও তো ওরই মতো বুড়ো—আমাদের বয়সের তফাৎ তো তেমনি আছে···কিন্তু ও আবার আত্মসম্বৃত। সেই লগ্নটি এসেছিল, চলেও গেল, আমি তর্ক-বিতর্ক করে লগ্নভ্রষ্ট হলাম। আমার পায়ের নীচের জমি যেন সরে সরে গেল।

দুদিন পরে ফোঁগেসমির থেকে চলে এলাম। ওর উপর তখন আমার ঘোর অসন্তোষ—নিজের উপরও। তখন মনের 'নীতিবাদের' প্রতি আমার ঘৃণা, আর কেমন এক বিদ্বেষ এসে দেখা দিয়েছে মনের এই ভাবনার বিরুদ্ধে। এই শেষ সাক্ষাৎকারে, এই প্রেমের অতিরঞ্জনে, আমার সমস্ত আবেগ যেন নিঃশেষিত। আলিসার প্রতিটি কথার বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত—কিন্তু সে তো জীবন্ত হয়ে আছে আমার মনে, জয়ী হয়েছে—আমার প্রতিবাদ বুকে মরে গেছে—তবু ও সর্বজয়ী হয়ে আছে। হাঁ, ও ঠিকই বলেছে। আমি তো প্রেতায়িত ছায়ার জন্যেই আকুল, যে-আলিসাকে ভালবাসতাম, এখনো বাসি—সে তো নেই।···হাঁ··· আমাদের বয়েস বেড়েছে! সমস্ত কাব্য মুছে গেছে। ওরই জন্য বুকখানা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে তো কিছুই নয়। এই তো স্বাভাবিক অবস্থা। আমি ওকে ধীরে ধীরে যদি দেবীর আসনে বসিয়ে থাকি, যা আমি ভালবাসি—শুধু কি তার ফল অসীম ক্লান্তি হয়ে রইল না? ও যখন আবার একা হবে—ওতো ওর মানসিক স্তরে ফিরে যাবে—সে তো মামুলী স্তর—আমিও তো সেখানেই চলে গেছি। কিন্তু সেখানে তো ও আমার কাম্য নয়। উঃ, কি অস্বাভাবিক লাগছে ওকে পাবার সেই উন্মাদ প্রয়াস—অথচ আমার প্রয়াসেই তো ওকে ঐ উত্তুঙ্গে আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

আঁদ্রে জিদ্

এ অহমিকা যদি কম থাকতো, আমাদের ভালবাসা বুঝি সহজ, স্বাভাবিক হয়ে উঠতো···কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন ভালবাসার মানে কি? কি হোত সে ভালবাসা রেখে? এতো একগুঁয়েমি, কিন্তু বিশ্বাস তো সেখানে থাকে না। কার প্রতি বিশ্বাস? মোহের প্রতি? তার চেয়ে স্বীকার করলেই হয়, আমার ভুল হয়েছিল।

এর মধ্যে স্কুলে একটা চাকরী জুটে গেল। কাজটা নিতে রাজি হলাম। উচ্চাভিলাষ বা আমাদের অনুভূতি ছিল না—চলে যাওয়াটাই তখন আমার কাছে বড় কথা—এ যেন এক অব্যাহতি।

আট

আর একবার আলিসার সঙ্গে দেখা হোল। তিন বছর পরে, গ্রীষ্মের শেষে দেখা। তার মাস দশেক আগে ওর কাছ থেকে মামার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম। আমি পালেস্তাইন থেকে ওকে এক দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তখন আমি ছিলাম সেখানে। কিন্তু চিঠির উত্তর পাইনি।

লা-হাভারে কি জন্যে সেবার গিছলাম মনে নেই। তারপর স্বভাবের বশেই ফোঁগেসমিরের পথে চললাম। আলিসা সেখানে আছে জানতাম। কিন্তু ভয় ছিল, ওকে হয়তো একা পাব না। নিজের আগমন আগে থেকে জানান দিই নি ; সাধারণ অভ্যাগতদের মতো নিজেকে জাহির করতে লজ্জাই লাগছিল। দ্বিধাভরে চললাম। হাজির হলাম। ভিতরে ঢুকবো কি না এই তখন প্রশ্ন। না, না দেখা করেই চলে যাব, দেখা করার চেষ্টা না করেই চলে যাব ? হাঁ, ঐ পথ ধরে ধরে যাব, গিয়ে বসে থাকবো বেঞ্চিতে। ওখানে ও বোধ হয় এখনো গিয়ে বসে।...অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কি অভিজ্ঞান আমি রেখে যাব। আমার আগমনের কথা জানাবে— এমন কি অভিজ্ঞান ? এমনি ভাবতে ভাবতে চলছিলাম ধীরে ধীরে। আমার তখন মন স্থির হয়ে গেছে, ওর সঙ্গে দেখা করবো না। দুঃখের তীব্রতা আমার বুক কুরে খাচ্ছিল—এখন সেখানে নামলো মেদুর সুন্দর বিষণ্ণতা। আমি গাছপালা-ঘেরা সড়কে এসে পড়লাম। ও যদি এসে হাজির হয়, তাই পদপথ ধরে চললাম। পথ আমার বাড়ি ঘেঁসে চলে গেছে। একটা উঁচু জায়গা জানি, যেখান থেকে বাগান দেখা যায়। উঠে এলাম উঁচু জায়গায় ; মালী পথ ঝাঁট দিচ্ছিল, ও মিলিয়ে গেল। উঠোনে যাবার নতুন ফটক তৈরী হয়েছে। আমি চললাম। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে

উঠলো। আরো দূরে যেখানে গাছপালা-ঘেরা সড়ক শেষ হয়ে গেছে—তারই কাছে এসে গেলাম—বাগানের পাঁচিল এখানে দাঁড়িয়ে আছে। বীচ বনের ভিতর গিয়ে হাজির। সরল রেখায় চলেছে সেটা পথেরই পাশাপাশি। আমি এবার এলাম সেই ছোট্ট দরজাটার কাছে। এখান থেকে খিড়কির বাগানে যাওয়া যায়। হঠাৎ চেপে বসলো ভিতরে যাবার ইচ্ছা।

দরজা বন্ধ। ভিতরের খিলটা শুধু সামান্য প্রতিরোধই করবে। কাঁধ দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলতে গেলাম···এমনি সময় পায়ের শব্দ ; আমি দেয়ালের কোণে আশ্রয় নিলাম।

কে আসছে বাগান থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলাম না। কিন্তু শুনলাম। অনুভব করলাম।

আলিসা! তিন পা এগিয়ে এল, দুর্বল স্বরে বললে, জেরোম, তুমি!

আমার বুকের দ্রুত স্পন্দন থেমে গেল! রুদ্ধ বুক থেকে এল না কথা, ও জোরে আবার বলে উঠলো, জেরোম তুমি!

অমন ডাক শুনে, আবেগ আমার উথলে উঠলো, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। তবু মুখে কথা নেই। আলিসা কয়েক পা এগিয়ে এল, দেয়ালের কোণে এসে ও হাজির। ওকে আমার নিজের দেহের উপর অনুভব করলাম—দেহের উপর! আমি তো হাঁটু গেড়ে বসে আছি। ওকে দেখতেও বুঝি আমার ভয়। ও আমার উপর কয়েক মুহূর্ত আনত হয়ে রইল। ওর দুর্বল পেলব হাত দুখানি চুম্বনে ভরে দিলাম।

কেন লুকিয়ে ছিলে জোরেম? ও এমন সহজ সুরে বললে, তিন বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদ যেন তিনটে দিনের।

কি করে বুঝলে, আমি।

তোমার আশায় তো পথ চেয়ে বসেছিলাম।

আমার আশায়? এমন অবাক হয়ে গেলাম যে শুধু ওর কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম। তখনো হাঁটু গেড়ে আমি বসে।

ও বলে চললো, বেঞ্চে বসি গে চল। আমার মনে হয়েছিল, তোমার সঙ্গে অন্তত আর একটিবার দেখা হবে। আজ তিনদিন ধরে রোজই সন্ধ্যেয় এখানে আসি—তোমার নাম ধরে ডাকি—যেমন আজ ডেকেছিলাম জেরোম।···তুমি উত্তর দাওনি কেন?

তুমি যদি হঠাৎ না এসে পড়তে, তোমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যেতাম, বললাম: আবেগের বিরুদ্ধে মন তখন ইস্পাত-দৃঢ় করে ফেলেছি। আবেগ তো আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। লা-হাভারে এসেছিলাম। ভাবলাম, গাছপালা-ঘেরা এই পথে ঘুরে যাই। বাগানের চারপাশে ঘুরে এই বেঞ্চির উপর এসে বিশ্রাম করছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, এখনও হয়তো তুমি এখানে এসে মাঝে মাঝে বস···তারপর তো······

দেখ, আজ তিনদিন ধরে সন্ধ্যায় এখানে বসে বসে আমি কি পড়ি? ও বাধা দিয়ে একতাড়া চিঠি বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। দেখে চিনলাম, আমারই ইতালী থেকে লেখা চিঠি। ওর দিকে চোখ তুলে তাকালাম সেই মুহূর্তে। অদ্ভুত পরিবর্তন ওর। শরীর শীর্ণ, ম্লান, আমার বুকে তো দাগা বাজলো। আমার বাহুর উপর ভর দিয়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে রইল। যেন ও ভীত, নয়তো শীতার্ত। এখনো গভীর শোক ওর সর্বাঙ্গে কালো পোষাক হয়ে ঘিরে আছে, কালো রুমাল মাথায় বাঁধা। মুখখানা যেন ফ্রেমে বাঁধানো মনে হয়—এতে আরো বিবর্ণতা বেড়ে গেছে। ও হাসছে, কিন্তু ওর জীর্ণ অস্থি-পঞ্জর তো ওকে বহন করতে অক্ষম। ফোঁগেস-মিরে ও একা আছে কিনা জানবার জন্যে তখন আমি ব্যগ্র।

না রোবার্ত আছে? জুলিয়েৎ, এডুয়ার আর তাদের ছেলেমেয়েরা

কাটিয়ে গেছে আগষ্ট মাসটা · বেঞ্চির কাছে এলাম, বসলাম, কয়েক মুহূর্ত সাধারণ তত্বতালাস ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চললো।

ও আমার কাজের কথা জিজ্ঞেস করলে। আমি 'ওকে জানিয়ে দিলাম, কাজে মন নেই। উত্তরটায় তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়া হোল কাজের কথা। ওকে হতাশ করাই তখন আমার উদ্দেশ্য, ও যেমন আমাকে হতাশ করেছে। জানিনা, সফল হয়েছিলাম কিনা- যদি হয়েই থাকি, ওর ভাব-ভঙ্গীতে তো তা প্রকাশ পেলে না। আমার কথা বলি, ভালবাসা আর বিরূপতা দুই-ই তখন আমার মনে। ওকে যথাসম্ভব রুক্ষভাবেই কথাগুলি বললাম। আবার নিজের উপরও রাগ হোল আবেগ কম্পনে। মাঝে মাঝে তো স্বর কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

অস্তমান সূর্য কয়েক মুহূর্ত মেঘস্তরের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল, এবার দিগন্তের শিয়রে এসে দেখা দিলে। ঠিক আমাদেরই মুখোমুখি। প্রান্তরের রিক্ততায় ঝলমল মহিমার ঢেউ বয়ে গেল, আমাদের পায়ের নীচের সংকীর্ণ উপত্যকায় হঠাৎ এনে ঢেলে দিলে ধনসম্ভার। স্তূপ গড়ে উঠলো বর্ণের সোনায়। তারপরে মিলিয়ে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। মেনি মূক আমি; মনে হোল একি এক স্বর্ণবর্ণী আনন্দে আমি আবৃত, আমি নিমজ্জিত। আমার বিক্ষোভ তো গেছে মিলিয়ে, ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই তখন নেই। আলিসা আমার উপরে ভর দিয়ে বসেছিল, আমার বুকে নেতিয়ে পড়েছিল। ও এবার উঠে বসলো। ওর বডিসের ভিতর থেকে পাতলা কাগজে মোড়া একটা খুদে বাণ্ডিল বার করলো। যেন আমাকেই ও দেবে। তারপর থেমে গেল; দ্বিধা এল। আমি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও বললে, জেরোম, শোন, এই সেই ক্রুশখানি। আজ তিন

দিন ধরেই তো সঙ্গে নিয়ে আসছি। বহুদিন পরে আবার ফিরিয়ে দিতে চাই তোমাকে।

আমি ওটা নিয়ে কি করবো? রূঢ় ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম।

আমার স্মৃতি হিসেবে তোমার মেয়েকে দিও।

আমার মেয়ে? চীৎকার করে উঠলাম। আলিসার কথা বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

স্থির হয়ে শোন; অমন করে তাকিও না। একেবারে তাকিও না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে তো এমনিই পারিনা—বড় কষ্ট হয় কিন্তু তবু তো বলতে হবে। আমাকে একথা বলতে হবে। জেরোম শোন, একদিন তুমি বিয়ে করবে। না বাধা দিওনা, কথা বেলোনা—এই আমার ভিক্ষা। শুধু তোমাকে তাই মনে রাখতে বলি—দীর্ঘদিন আগে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম—খুব ভালোবেসেছিলাম। তিন বছর আগেকার কথা। আমার একদিন মনে হয়েছিল, তোমার মেয়ে হয়তো এই খুদে পদকখানা পরবে গলায়, আমারই স্মৃতি হিসেবে পরবে। কার সে নিজেই জানবে না···হয়তো বা তুমি আমারই নামে তার নামকরণও করবে।

ও থামলো, গলা বুজে এল আবেগে। আমি চীৎকার করে উঠলাম। এ চীৎকার যেন বিরূপভাব প্রসূত।

দেবার অতো যদি ইচ্ছে, নিজেই সে মেয়েকে দিও না?

ও কি বলতে গেল। ঠোঁঠ কেঁপে কেঁপে উঠলো। যেন শিশুর ফোঁপানি। কিন্তু কান্না ঝরে পড়লো না। চোখে অসামান্য এক আলো ঝলমলিয়ে উঠছে, আর তারই বন্যায় মুখখানি দীপ্ত। যেন লৌকিক নয়, স্বর্গীয় সৌন্দর্যে সে জ্যোতিষ্মান।

আলিসা! আমি কাকে বিয়ে করবো বল? তুমি তো জান, একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে আমি পারবনা··· হঠাৎ ওকে উন্মাদের মতো দুবাহু দিয়ে টেনে নিলাম, বর্বরের মতো

টেনে নিলাম। তারপর চুম্বনে চুম্বনে নিষ্পেষিত করে দিলাম ওর অধর। ও এলিয়ে পড়লো, নেতিয়ে পড়লো আমার দেহের উপর। নিষ্প্রভ ওর চোখ। চোখ বুজে এল। ওর মিষ্টি স্বর ভেসে এল আমার কানে। তার বিশ্বস্ততা আর মধুরতার তো তুলনা কোনদিন মিলবে না! ও বললে, বন্ধু, আমার উপর একটু দয়া কর! আমাদের ভালবাসাকে ধ্বংস করে দিও না। হয়তো ও একথাও বলেছিল, অমন ভীরুতা কেন তোমার! হয়তো ও বলেনি, আমি নিজেই মনে মনে বলেছিলাম। একথা ঠিক বলতে পারি না; হঠাৎ ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার এ আলিঙ্গন পবিত্রতায় মহান হয়ে উঠলো।

বললাম, যদি ভালই বাস, তাহলে আমাকে চিরদিন অমনি দূরে ঠেলে রাখছ কেন? ভাব তো একবার! প্রথমে জুলিয়েতের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করলাম। তুমি ওকে সুখী দেখতে চাও, একথা বুঝেই আমি চুপ করে ছিলাম। ও এখন সুখী। তুমি নিজেই সে কথা বলেছ। বহুদিন মনে হয়েছে, বাবাকে ছেড়ে আসতেও তুমি চাও না। কিন্তু এখন তো তুমি আমি দুজনেই একা।

ও অস্ফুট স্বরে বললে, অতীত নিয়ে এখন আমরা দুঃখ না-ই-বা করলাম। আমি তো সে পাতা উল্টে দিয়েছি।

আলিসা, এখনো সময় আছে।

না, বন্ধু, সময় নেই। যেদিন থেকে আমাদের ভালবাসা তার চেয়েও মহান কিছু আবিষ্কার করেছে, সেই মুহূর্ত থেকে সময় তো চলে গেছে। আর নেই, নেই! বন্ধু, তোমাকে ধন্যবাদ, আমার স্বপ্ন এখন কোন্ এক উচ্চ শিখরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে পার্থিব সুখকে তো তুচ্ছ বলেই মনে হবে। সে তো সুখ নয়, সে হবে সুখের হ্রাস। আমি প্রায়ই ভেবে দেখি, আমাদের দুজনের একত্র জীবন কেমন হোত। যে মুহূর্তে সে পরিপূর্ণতা থেকে এক চুল

সরে আসতো—সেই মুহূর্তে মনে হোত, আমাদের ভালবাসা অসহ্য।

কিন্তু পরস্পরকে ছাড়া জীবন কি করে কাটবে সে কথা কি কখনো ভেবেছ আলিসা ?

না, ভাবিনি।

এবার তো ভাববে ! গত তিনবছর ধরে তোমাকে ছাড়া আমি তো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি।···

রাত হয়ে আসছিল।

বড় শীত ! ও উঠে পড়ে শালখানা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে নিলেন। এবার ওর হাত আবার ধরলাম।···বাইবেলের সেই কথাটা মনে আছে, যে কথাটা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। মনে হোত অর্থ ঠিক বুঝিনি এরা তো প্রতিশ্রুত বস্তু পেল না···ভগবান আমাদের ওর চেয়েও ভাল সেরা জিনিস দেবেন।

তুমি কি এখনো ওকথা বিশ্বাস কর ?

করি—নিশ্চয়ই করি।

কিছুক্ষণ পাশাপাশি হেঁটে চললাম। কথা নেই। আবার ও বলতে লাগলো, জেরোম, ভাবতে পার ? ওর চেয়েও সেরা জিনিস-ভাল জিনিস ! হঠাৎ চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো জল। ও আবার আওড়ালে—আরো সেরা জিনিস।

বাগানের ছোট্ট দরজাটার কাছে এসে গেলাম। ওইটে দিয়েই ও কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে এসেছিল, আমার দিকে ফিরে এবার বললে, আসি এবার, আর তোমাকে আসতে হবে না। প্রিয় বন্ধু আমার, বিদায় ! এবার সুরু হবে সেই সেরা জিনিস....

একবার তাকালে আমার দিকে। আমার কাঁধে ওর হাত রাখলো। ওর দৃষ্টি যেন একযোগে আমাকে বন্দী করে রাখলো

নিবিড় বন্ধনে, আবার দূরে সরিয়ে দিলে। ওর চোখ অনির্বচনীয় প্রেমের আলোয় দীপ্ত।

যেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল, যেই অর্গল এঁটে দেবার শব্দ শুনলাম, আমি দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এক চরম হতাশা আমাকে ছেয়ে ফেলেছে। রাতের অন্ধকারে বহুক্ষণ কাঁদলাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম।

কিন্তু ওকে ধরে রাখতে তো পারতাম না ; পারতাম না দরজা ভেঙে বা অন্য কোন উপায়ে বাড়িতে ঢুকতে। বাড়ির দরজা তো আমার কাছে সেদিন বন্ধ ছিল না—এখনো তো বন্ধ নয়। আমার পক্ষে সম্ভব হোলনা, কিছু করা। এখানে আমার মনের এই অভি-ব্যক্তি যিনি না বুঝবেন, তিনি তো আমাকে এখন পর্যন্ত বুঝতেই পারেন নি।

অসহ্য উদ্বেগে অধীর হয়ে কয়েকদিন পরে জুলিয়েতকে লিখলাম চিঠি। ওকে জানালাম ফোঁগেসমিরে যাওয়ার কথা, আলিসার বিবর্ণ জীর্ণশীর্ণ দেহ দেখে কতখানি শংকিত হয়েছি সেকথাও লিখলাম। অনুরোধ করলাম, ও যেন ওর চিকিৎসার যাহোক কিছু ব্যবস্থা করে আমাকে জানায়। আমি তো আলিসার কাছ থেকে চিঠি পাব বলে আর আশা করি না। তারপরে একমাসও হয়নি, এমন সময় এল এই চিঠিখানা।

প্রিয় জেরোম,

তোমাকে একটা বড় দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের আলিসা আর নেই ! হায়, তুমি চিঠিতে যা আশংকা করেছিলে তাতো খুবই সত্যি। এই কয়েক মাস ধরেই ও শুকিয়ে যাচ্ছিল। অসুখ ওর হয়নি। আমার অনুরোধে শেষে ও

ডাক্তার এ-কে দেখাতে রাজি হয়। তিনি আমাকে জানান, এমন কিছু নয়। কিন্তু তোমার চলে আসার তিন দিন পরে ও ফোঁগেসমির ছেড়ে চলে যায়। রোবার্তের চিঠি থেকেই সে খবর পাই। ও আমাকে ক'চিৎ কখনো চিঠি লেখে। রোবার্তের চিঠি না পেলে ওর চলে যাবার খবর কিছুই জানতাম না। ওর দীর্ঘ নীরবতায় আমি তো তখন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। রোবার্তকে দুষে চিঠি লিখলাম, ও কেন এভাবে ওকে যেতে দিলে। ওকে নিয়ে সে পারী চলে গেল না কেন? তুমি কি বিশ্বাস করবে জেরোম, সেই থেকে ওর কোনো ঠিকানা আমরা জানতাম না। আমার উদ্বেগ কি হয়েছিল বুঝতেই পার। তখন দেখা তো দূরের কথা, ওকে চিঠি লেখাও যাচ্ছে না। রোবার্ত ক' দিন পরে পারী গেল, কিন্তু গিয়ে ওকে আবিষ্কার করতে পারেনি, ও এমন কুড়ে যে, ও যে উপযুক্ত সন্ধান করতে পেরেছে সেই সম্বন্ধেই আমাদের সন্দেহ ছিল। শেষে পুলিশে খবর দিতে হোল। অমন অনিশ্চয়তার মধ্যে কি থাকা যায়! এদুয়ার নিজে গেলেন এবার, তার পর একটা অখ্যাত নার্সিং হোমে পেলেন ওকে। কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আমি হোমের অধ্যক্ষের কাছ থেকে ওর মৃত্যুর খবর পেলাম। আর সেই সঙ্গে এল এদুয়ারের তার। তিনিও গিয়ে ওকে দেখতে পাননি। শেষ দিনে ও একখানা খামে আমাদের ঠিকানা লিখে দিয়েছিল, যাতে আমরা খবরটা জানতে পারি। আর—একখানা খামে ছিল লা-হাভারের উকিলকে পাঠানো চিঠিখানার নকল। ওতে ছিল ওর শেষ নির্দেশ। এই চিঠির একটা জায়গায় তোমার সম্পর্কে কিছু লেখা আছে। আমি তোমাকে শীগ্গীরই তা জানাব। এদুয়ার আর রোবার্ত' অন্ত্যেষ্টির সময় এসেছিল। গত পরশু সব চুকে বুকে গেছে।

শুধু ওরা একাই নয়। নার্সিং হোমের কয়েকজন রোগীও কফিনের সঙ্গে সঙ্গে কবরখানায় যেতে চেয়েছিল। ওরা অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের সময় হাজিরও ছিল। আমার খবর দিচ্ছি। আমার পঞ্চম শিশু যে কোনোদিন ভূমিষ্ঠ হতে পারে। আমি তো তাই যেতে পারিনি। বড়ই দুঃখ হচ্ছে।

প্রিয় জেরোম, ওর মৃত্যুতে তুমি যে কি হারালে, কি যে তোমার দুঃখ তা আমি জানি। আমিও ভাঙা বুকে এ চিঠি লিখছি। আজ দুদিন ধরে

বিছানায় পড়ে আছি। লিখছি অতি কষ্টে। এদুয়ার কি রোবাত'কে তো তোমাকে এখবর জানাবার ভার দিতে পারিনা! আমরা শুধু দুজনেই যে ওকে এ পৃথিবীতে ভাল করে জানতাম। এখন তো আমি প্রায় বুড়ি হয়ে পড়েছি—পরিবারের বুড়ি গিন্নিও বলতে পার, অতীতের সেই উজ্জ্বল দিনগুলি তো এখন ছাইয়ের গাদায় চাপা পড়ে গেছে। তাই তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা রাখি। যদি কাজে বা বেড়াতে কখনো নিমেস-এ এসে পড় আমাদের আগিয়ে-ভিভেয় এসো। এদুয়ার তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবেন। আর আমরা দুজনে আলিসার কথা বলতে পারব প্রাণভরে। জেরোম, আসি তাহলে।

—তোমার স্নেহের

কদিন পরে জানলাম, আলিসা ফোঁগেসমির তার ভাইকে দিয়ে গেছে। তবে বলেছে, ওর নিজের ঘরের আর কয়েকখানা আসবাবপত্র জুলিয়েতকে দেওয়া হবে। আমি কদিন পরে পেলাম কিছু কাগজপত্র। একটা পুলিন্দা করে ও আমার ঠিকানা লিখে রেখেছিল। এও জানলাম, যে-ক্রুশ-পদকখানি আমি শেষ সাক্ষাতে নিতে চাইনি, ওর অন্তিম ইচ্ছা ছিল অন্ত্যেষ্টির সময় ওর গলায় সেখানি যেন পরিয়ে দেওয়া হয়। এদুয়ার বলেছিল, ওর সেই ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছিল। আমার কাছে যে পুলিন্দাটি য়্যাটর্নি পাঠিয়েছিলেন, তাতে ছিল আলিসার ডায়েরী। এখানে আমি বেশ কয়েকখানি পাতা তুলে দিচ্ছি। ভাষ্য না করেই তুলে দিলাম। পড়তে পড়তে আমার কি মনে হয়েছিল, সে-কথা আপনারা কল্পনা করতে পারেন। হৃদয়ে যখন তুমুল তোলপাড় ওঠে তখন কি ভাষ্য চলে! ভাষ্য করলে সে হোত অস্পষ্ট, মনের ভাবাবেগের হদিশ তো তেমন মিলতো না।

আলিসার ডায়েরী

পরশু লা-হাভার ছেড়েছি। কাল তাই নিমেসে এসেছি। এই প্রথম আগমন ! ঘর-সংসারের কাজ নেই, রান্না-বান্নার তদারক নেই, একটু যেন আলসেমি লাগছে। আজ ২৩শে মে, ১৮৮— আমার পঁচিশ বছরের জন্মদিন। আজ শুরু করলাম এই ডায়েরী লেখা। মনের আনন্দে নয়, শুধু সঙ্গ পাবার লোভে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে একা লাগছে, মনে হচ্ছে এ যেন এক বিদেশ, এখনো তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কিন্তু নর্মাণ্ডির মতোই তো এ অঞ্চল, ফোঁগেস-মিরে যেকথা শুনেছি—এখানেও তো তারই পুনরাবৃত্তি হবে। ভগবানের তো কোন আলাদা সত্তা নেই। কিন্তু দখিণ অঞ্চলের··· ভাষা তো আমি শুনিনি। তাই কান পেতে রয়েছি।

২৪শে মে

আমার কাছেই একটা শোফায় বসে জুলিয়েৎ ঝিমুচ্ছে।— এ একটা ছাদবিহীন গ্যালারি—ইতালীয় ধরণে তৈরী—বাড়ীর প্রধান আকর্ষণ এইটি। এই গ্যালারির পরেই কাঁকর-বিছানো উঠোন। বাগানেরই সেটি এক অংশ, অঙ্গ। সোফা থেকেই জুলিয়েৎ দেখতে পায়, ঘাসে ভরা জমি গিয়ে মিশেছে জলে। এক ফালি এক জলের রেখা, সেখানে বিচিত্র বর্ণের একপাল হাঁস খেলা করছে। আর ভেসে বেড়াচ্ছে দুটি রাজহাঁস। ওরা বলে, এই যে ঝিরঝিরে ছোট্ট নদী এতো গ্রীষ্মের গরমে শুকোয় না। বরং বাগানকে সরস করে দিয়ে বয়ে বয়ে যায়—তারপরে মিশে যায় ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে—এক দিকে শুষ্ক নদীগর্ভ, অন্যদিকে আঙুর বাগিচা তাকে ঘিরে রাখে,— শেষে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলিয়ে পড়ে দুয়ের মাঝখানে।

আঁদ্রে জিদ্

এতুয়ার তিসিয়ের বাবাকে কাল বাগান, খামারবাড়ি, মদ্য সংরক্ষণের সেলার আঙুর বাগিচা সব দেখালে। আমি জুলিয়তের সঙ্গেই রইলাম। তাই আজ সকালে, আমার অভিযানের প্রথম আবিষ্কার সম্ভব হোল। কত উদ্ভিদ আর অপরিচিত গাছপালা। ওদের নামগুলো জানতে আমার ভারী ইচ্ছে। দুপুরে খাবার সময় যাতে জেনে নিতে পারি, তাই ওদের ছোট ছোট ডাল ভেঙে নিলাম। কতগুলির ভিতরে দেখলাম চিরসবুজ সেই ওক—জেরোম তো ভিলাবর্গেস না ডোরিয়া পাঁফিলির বাগিচায় ঐগুলি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—আমাদের উত্তর অঞ্চলের গাছের চেয়ে কত আলাদা! পার্কের একেবারে প্রান্তে গাছপালার ভিতরে একটি ফাঁকা জায়গা। বড় সংকীর্ণ, বড় রহস্যময়। ঘাসের গালিচা যেন বিছিয়ে আছে সেখানে। দেখে মনে হয় বন-দেবীদের মজলিসের জায়গা। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভয় পাচ্ছি—ফোঁগেসমিরে আমার প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা ছিল খৃষ্টধর্ম-সম্মত, এখানে আমারই অজান্তে সে যেন আধা বর্বর হয়ে উঠলো। তবু মনে ভীতির পীড়ন তো এখন আরো ধর্ম-প্রবণ হয়ে উঠছে। ফিসফিস করে বলি,······বাতাস যেন স্ফটিকস্বচ্ছ, অপূর্ব নীরবতা। ওরফিউসের (গ্রীক পুরাণোক্ত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ) কথা, আরমিদার (গ্রীক পুরাণোক্ত গায়িকা) কথা মনে পড়লো, অমনি এক নিঃসঙ্গ পাখীর গান উঠলো আমারই আশেপাশে। বিষাদিত তান, বিশুদ্ধ তান—মনে হোল সমস্ত প্রকৃতি যেন ওকে বরণ করবার জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল। বুক কেঁপে কেঁপে উঠলো ভীষণ আবেগে; আমি গাছে ঠেস দিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কেউ আসার আগেই চলে এলাম।

২৬শে মে

এখনো জেরোমের কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি। ও যদি লা-হাভারের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে থাকে, তাহলে তো এখানে ও-চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হোত। এ উদ্বেগ আর কাউকে জানাইনি, শুধু ডায়েরী বইখানাকে জানালাম ; আজ তিন দিন ধরে তো এখানার সঙ্গ থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিযুক্ত হইনি— লা-বো ভ্রমণে, কি পড়ার সময়, কি প্রার্থনায় এখানাই ছিল আমার সঙ্গী। আজ তো লেখার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না ; আগে-ভিভেতে এসে কি এক অদ্ভুত বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। হয়তো বা অকারণে, কিন্তু তবু আমার মনের গভীরে তার অনুভব আমি পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, বহুদিন থেকেই ওখানে সে থিতিয়ে ছিল। আমার মনের যে-আনন্দের আমি গর্ব করতাম, সেই গর্বই তাকে শুধু ঢেকে রেখেছিল।

২৭শে মে

কেন নিজেকে মিথ্যে কথা বলে বোঝাব ? আমার মানসিক প্রয়াসের ফলেই জুলিয়েতের সুখে আমি সুখী হয়েছিলাম। ঐ যে সুখ, যার কামনায় আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, আজ তো সে আমার কাছে ব্যথা হয়ে ফুটে উঠেছে। ও তো বিনা কষ্টে পেল সেই সুখ, আমি আর ও যা কল্পনা করেছিলাম—তার থেকে তো এ সুখ আলাদা। কি জটিলতা ! হ্যাঁ...বেশ বুঝতে পারছি, আমার ভিতরে এক তীব্র অহংজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব হয়েছে। আর আমার আহুতিদানে ও সুখলাভ করেনি—একথা সে বুঝেছে—ওর সুখে আমার আত্মাহুতির তো প্রয়োজন ছিল না।

জেরোমের নীরবতায় আমার নিজের উদ্বেগ দেখে এখন আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি...এ আত্মাহুতি কি আমার মনে পূর্ণতা পেয়েছিল ? না। আমি তো অপমানিত, অবহেলিত। ভগবান বুঝি এমন হবে তা চাননি। তার মানে কি আমি এর উপযুক্ত নই ?

২৮শে মে

আমার বিষণ্ণতার এই বিশ্লেষণ কি বিপজ্জনক! আমি তো এখন বইখানির প্রতি আকৃষ্ট! যে ব্যক্তিগত গর্বকে জিনে নিয়েছিলাম বলে ভেবেছি, সে-ই কি এখানে তার অধিকার জারী করছে? না তো! আমার আত্মা যেন এই ডায়েরীখানাকে আমার তোষামোদের আরসী বলে মনে না করে, সে যেন এখানে নিজের ছায়া ফেলে নিজের সজ্জার পারিপাট্য না করে! অলসতার জন্যে আমি লিখছি না। প্রথমে তো তাই-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন জানি আমার মনের বিষণ্ণতার প্রেরণায় লেখা। বিষণ্ণতা তো পাপেরই এক অবস্থা—তাকে আমি চাই না, ঘৃণা করি, তার জটিলতা থেকে আমার আত্মাকে মুক্ত করতে চাই। এই ডায়েরী বইখানা সেদিক থেকে আমার আত্মার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে বলেই আমার আশা।

বিষণ্ণতা তো জটিলতা। আর সুখের বিশ্লেষণ তো কখনো করিনি।

ফোঁগেসমিরে আমি ছিলাম একা, এখন তো আরো একা। কিন্তু তখন অনুভব করিনি কেন? জেরোম যখন ইতালী থেকে চিঠি লিখতো, আমার মনে হোত, ও আমাকে নিয়ে ছাড়া দেখতে চায় না কেন—বাঁচতে চায় না কেন? ওর ভাবনা অনুসরণ করে আমি বেড়াতাম, ওর আনন্দ থেকেই পেতাম আমার আনন্দ। আর এখন, আমার নিজের অজান্তে—ওকে আমি চাই···ওকে ছাড়া যা দেখি তাতেই বিরক্ত লাগে।

১০ই জুন

ডায়েরী এখনো সেভাবে শুরু হয়নি, এরই মধ্যে দীর্ঘছেদ পড়েছিল। খুদে লিসের জন্ম হোল। জুলিয়েতের বিছানার পাশে দীর্ঘ প্রহরগুলি কেটে গেল। জেরোমকে যে কথা লিখতে চাই, সে কথা

এখানে লিখে আর আনন্দ পাচ্ছিনে। বেশীর ভাগ মেয়েদের যে ত্রুটি স্বাভাবিক সেই অসহ্য ত্রুটি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাই—বেশি লেখার সে ত্রুটি। আমার এই ডায়েরীখানাকে সেদিক থেকে বিশুদ্ধ রাখতে চাই।

তারপরে কয়েক পাতা নানা বই থেকে মন্তব্য, উদ্ধৃতি। তারপরে ফোঁগেসমিরের তারিখ দেওয়া চিঠি

১৬ই আগষ্ট

জুলিয়েৎ সুখী। সে তো বলে মনেও হয়। আমার সন্দেহ করবার কোনো অধিকার নেই, কারণ নেই। কি করে এল এই অসন্তোষের অনুভূতি এই ভালো না লাগা? ওর সঙ্গে থেকে এখন তো সেই অনুভূতিই আমাকে ছেয়ে ফেললো। হয়তো আমি ভাবছি এই সুখ বস্তুবাদী, সহজে একে পাওয়া যায়, একে মেপে মেপে নেওয়া যায়। আত্মাকে পিষে ফেলে, শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়....এখন নিজেকে জিজ্ঞেস করি, সত্যই কি সুখ চেয়েছিলাম—না সুখের পথে অগ্রগতি। হে প্রভু, যে সুখ অনায়াসে মেলে সেই সুখ থেকে আমাকে রক্ষা কর! আমার সুখকে দূরে সরিয়ে রাখবার শক্তি দাও—তোমার মতোই সুদূরে তাকে সরিয়ে রাখো প্রভু।

কয়েক পাতা এখানে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের লা-হাভারের সেই শোকাবহ সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ছিল। ডায়েরী আবার তার পরের বছর থেকে শুরু হয়েছে। তারিখ নেই পাতায়, কিন্তু দেখে মনে হয় ফোঁগেসমিরে যখন ছিলাম তখনকার লেখা।

যখন ওর কথা শুনি, তখন মনে হয় নিজেকে দেখছি, লক্ষ্য করছি নিজের চিন্তাধারা। ও আমার কাছে ব্যাখ্যা করে, আমার সত্তাকে আবিষ্কার করে, দেখিয়ে দেয় আমাকে—শুধু ওকে ছাড়া কি আমার অস্তিত্ব থাকবে? ওর সঙ্গে যখন থাকি—তখনি তো আমি—আমি হয়ে উঠি।....

কখনো বা দ্বিধা আসে মনে, ওর জন্যে আমার যে অনুভূতি এ কি মানুষ যাকে ভালবাসা বলে তাই—কিন্তু ভালবাসার যে ছবি সবাই আঁকে—তাতো আমি যে ছবি আঁকতে চাই তার চেয়ে কত আলাদা! আমি তো কোনো কথা বলতে চাই না। ওকে যে ভালবাসি একথা না জেনেই ভালবাসতে চাই। আমি ওকে না জানিয়েই ভালবাসতে চাই।

ওকে ছাড়া যে-জীবন তার প্রতি তো আর আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই। আমার এক মাত্র ধর্ম ওকে সুখী করা কিন্তু ওর সঙ্গে যখন থাকি—তখন তো আমার ধর্ম—আমার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

পিয়ানো শিখতে ভাল লাগছে। মনে হয়, রোজই কিছুনা কিছু শিখছি, এগোচ্ছি। বিদেশী ভাষায় লেখা বই পড়তে গিয়েও ঐ একই আনন্দ পাই। আমাদের নিজেদের ভাষার চেয়ে যে অন্য ভাষা পছন্দ করি তা নয়। অন্য দেশের লেখকদেরও যে বেশী পছন্দ করি তাও নয়—কিন্তু ওদের লেখা আর অনুভূতির তাৎপর্য বুঝতে খানিকটা কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এই দুরূহতা অতিক্রম করবার অজানিত গর্বই আমার বুদ্ধিবৃত্তির আনন্দ যোগায়, সফল থেকে সফলতর হতে পেরে আমি গর্বিত হই। কেমন এক আত্মিক আনন্দ ঘনিয়ে আসে। সে আনন্দ না পেলে তো আমার চলে না।

যেখানে মনের প্রগতি নেই, যতই সে অবস্থা সুখের হোক সে তো আমার কাছে কাম্য নয়। স্বর্গীয় সুখ তো আমার কাছে ভগবানের সত্তাকে হেঁয়ালি বলে নয়, উপলব্ধি করার ভিতরে নয়, আমি তাঁকে অসীম বলে ভাবতে চাই—তাঁরই সান্নিধ্য পাবার আমার অবিরাম প্রচেষ্টা। কথার কারিকুরিতে যদি না ভরাই—তাহলে বলবো, যে আনন্দ প্রগতিধর্ম্ম নয় তাকে তো আমি তুচ্ছ করি।

আঁদ্রে জিদ্

গাছপালা ঘেরা সড়কের বেঞ্চি খানায় আজ সকালে আমরা বসেছিলাম। দুজনেই নীরব, কথা বলার তাগিদ বোধ করিনি··· হঠাৎ ও আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো, আমি পরলোকে বিশ্বাস করি না।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, জেরোম, শুধু বিশ্বাস নয়, বিশ্বাসের চেয়েও বেশি—আশার চেয়েও বেশি, এতো সুনিশ্চিত ব্যাপার।

হঠাৎ মনে হোল, আমার সমস্ত আস্থা যেন ঐ চীৎকারে আমি ঢেলে দিলাম।

ও বললে, আমি জানতে চাই······বলে চুপ করে গেল। আবার বললে, তোমার আস্থা না থাকলে কি অন্য পথে চলতে ?

উত্তর দিলাম, কি করে বলবো ; তারপরে বললাম, প্রিয়, তোমার ইচ্ছে না থাকলেও তো তুমি অন্য পথে চলতে পার না। তুমি যেন তখন এক জীবন্ত এক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত। তুমি যদি অন্য প্রকৃতির মানুষ হতে আমি তো তোমাকে ভালবাসতাম না।

না, না, জেরোম. পরলোকে ক্ষতিপূরণ হবে বলেই কি আমাদের ধর্ম আচরণ। আমাদের ভালবাসা কি ক্ষতিপূরণ দাবী করে। উদার যার আত্মা, সে তো প্রয়াসের পুরস্কার পাবে শুনলে আঘাত পায়। ধর্মকে সে তো নিজের আভরণ ভাবে না, ধর্ম তো আত্মার সৌন্দর্যের এক রূপ।

বাবা আর সেরে উঠেন নি। তেমন কিছু নয়, কিন্তু আজ তিনদিন ধরে শুয়ে—দুধ খেয়ে আছেন।

কাল সন্ধ্যেয় তখন জেরোম ওর ঘরে চলে গেছে। বাবা আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য চলে যান। আমি সোফায় বসেছিলাম—বরং শুয়েই ছিলাম। অথচ কেন যে শুলাম জানিনা। আলোর ঢাকনিটার দৌলতে আমার চোখে আলো পড়েনি, আমার দেহের উপরের দিকটাই আলো থেকে সুরক্ষিত।

পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, পোষাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে পা, তার উপরে আলো এসে চল্‌কে পড়েছে। বাবা এবার ফিরে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদ্ভুত হাসি ওঁর মুখে। আবার বিষাদের রেশও আছে। কেমন যেন লজ্জা করছিল, উঠে পড়লাম। উনি আমাকে ডাকলেন।

আমার পাশে এসে বোস, উনি বললেন। মনে হোল, যেন আর সময় নেই এমনি তাড়া। উনি আমাকে মার কথা বলতে লাগলেন। মা চলে যাবার পর থেকে তো কখনো বলেন নি। বললেন, কি করে বিয়ে হল, কতখানি ভালবেসেছিলেন, মা ওঁর কাছে কতখানি ছিলেন।

ওঁকে শেষে বললাম, বাপি, আজকেই কেন এসব কথা তুমি বলছ—আজকেই কেন বিশেষ করে এসব কথা তোমার মনে পড়ছে ?

আমি যখন ঘরে এলাম, দেখি তুমি সোফায় শুয়ে আছ। আমার মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল—তোমার মা বুঝি।

এত করে যে জিজ্ঞেস করলাম, তার কারণ ছিল। সেদিন সন্ধ্যেয় জেরোম আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল বই। ওকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু ওর নিশ্বাস অনুভব করছিলাম। আর দেহের উষ্ণতা আর স্পন্দন। পড়ার ভাণ করছিলাম বটে, কিন্তু মন তো তখন স্তব্ধ। ছত্রগুলো পর্যন্ত চেনা যায় না, এমন এক অনুভূতি এসে দেখা দিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হলাম। মনে হোল, এরপরে বোধহয় সে শান্তি লোপ পেয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। ভাগ্য ভালো ও কিছু বোঝেনি। কিছুক্ষণ পরে, যখন বসবার পরে সোফায় একা শুয়ে ছিলাম, বাবা আমাকে মা বলে ঠাওরালেন। কি অশ্চর্য—তখন আমি মার কথাই ভাবছিলাম।

কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। কি এক ব্যথায় কি এক দহন যেন আমার অতীতের স্মৃতিতে হানা দিয়েছিল। ঘুমের তাল কেটে যাচ্ছিল বার বার। এ যেন বিষাদের ঢেউ এসে আমাকে ঘিরে ফেললে।

প্রভু, সব কিছু পাপ তার ভীতি সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দাও।

বেচারী জেরোম! ও যদি জানতো, এমন অনেক মুহূর্ত আসে, যখন ও শুধু একটা ইঙ্গিত করলেই হয়, আর আমি তারই অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকি।...

যখন ছোট ছিলাম, ওর জন্যেই সুন্দর হতে চাইতাম। এখন মনে হয়, ওকে ছাড়া আমি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারব না। অথচ ওকে ছাড়াই তো সেই সম্পূর্ণতা লাভ সম্ভব। কিন্তু প্রভু, তোমার এ-বাণী তো আমার আত্মাকে ব্যথিয়ে তোলে।

যেখানে ধর্ম ভালবাসায় মিশে গেছে সে আত্মা কি সুখী! কখনো কখনো সন্দেহ হয়, ভালবাসা ছাড়া কি ধর্ম আছে! ভালবাসা...শুধু ভালবাসা...আরো আরো ভালবাসা...হায়, ধর্মকে আবার কখনো বা ভালবাসার প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়। আমার মনের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা, তাকে আমি ধর্ম বলতে সাহস করি? হায়, একি প্রলোভন, একি ছলনা! সুখের একি মায়ামরীচিকা!

লা ব্রুয়েরে আজ সকালেই পড়েছি,

এই জীবনে, মানুষ এমন আনন্দের সাক্ষাৎ পায়, যে আনন্দ তার প্রিয়, কোমলতায় মেদুর—অথচ সে তো তার কাছে নিষিদ্ধ— তখন তার পক্ষে তারই কামনা তো স্বাভাবিক, এ ধর্ম যদি আমাদের সবকিছু আহুতি দিতে শেখায় তাহলেই এই মোহ আমরা অতিক্রম করতে পারি।

আঁদ্রে জিদ্

কেন এই নিষেধের কথা আবিষ্কার করলো আমার মন? তবে কি আমি মোহে মুগ্ধ?—এ মোহ কি ভালবাসার মোহ থেকে ঢের বেশি শক্তিশালী? আমাদের আত্মাকে কি আমরা ভালবাসার শক্তিতে ভালবাসার উর্ধে নিয়ে যেত পারি না?

হায় এখন তো বেশ বুঝতে পারছি, ভগবান আর ওর ভিতরে আমি নিজে ছাড়া তো আর কোন বাধা নেই। ও যেমন বলে, আমার প্রতি ওর ভালবাসা ওকে ঈশ্বরমুখী করেছিল, কিন্তু আমার ভালবাসা তো ওকে বাধাই দিচ্ছে। ও আমাকে ভালবাসে; আমার সহবাসে আনন্দ পায়, আমি তো ওর কাছে আদর্শ—তাই তো ধর্মের পথে আর এগোতে পারছে না। কিন্তু দুজনের একজনকে তো সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। হে প্রভু, আমার এই ভীরু হৃদয়ের ভালবাসাকে পরাস্ত করতে গিয়ে তো হতাশ হয়েছি, তাই আমাকে তুমি শক্তি দাও—যাতে ও আমাকে আর ভাল না বাসে তাই যেন হয়। আমার নিজের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে আমি যেন ওকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে পারি···তাই তো আমার কাছে কাম্য···আজ যদি আমার আত্মা ওকে হারিয়ে দুঃখে আর্তনাদ করে ওঠে, তোমার মধ্যে তাকে আবার ফিরে পাব, সেই কি আমার পরম লাভ নয়?

প্রভু, বল, বল! কে তোমাকে সবচেয়ে পাবার উপযুক্ত? আমাকে ভালবাসার জন্যেই কি ওর সৃষ্টি—ও কি তার চেয়ে বড় কিছুর জন্যে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নি? ও যদি আমার নাগাল পেয়েই থেমে যেত, আমি কি ওকে এমনি করে ভালবাসতে পারতাম? যা কিছু মহান হতে পারত, সব পর্যবসিত হোত সুখে।

রবিবার

ঈশ্বর আমাদের জন্য উচ্চতর আনন্দের ব্যবস্থা করেছেন।

আঁদ্রে জিদ্

সোমবার, ৩রা মে

সুখ আছে, কাছে আছে, সুমুখে এনে ধরেছে—শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই ওকে ধরা যায়—ভাব তো একবার!

আজ সকালে ওর সঙ্গে আলাপ করতে-করতে আমাকে পূর্ণাহূতি দিয়েছি।

সোমবার সন্ধ্যা

কাল ও চলে যাবে···

প্রিয় জেরোম আমার, এখনো তোমাকে সেই অসীম স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছি—এখনো তেমনি ভালবাসি। আমার চোখে, ঠোঁটে, আমার আত্মায় যে সংসারের ঠুলি চাপিয়ে বসে আছি—সে তো এমন কঠোর যে, তুমি চলে যাচ্ছ—এ আমার এক স্বস্তি···এক তিক্ত তৃপ্তি।

যুক্তি-মতো কাজ করতে চাইছি, কিন্তু কাজের সময় যুক্তি তো হারিয়ে যায়। অথবা যুক্তিকে মনে হয় নির্বুদ্ধিতা। আর তো আমার নিজের যুক্তির উপর বিশ্বাস নেই।

যে-যুক্তি আমাকে ওর কাছে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এল, এখন তো আর তার উপর আস্থা নেই···তবু সরে এলাম। কারণ না জেনে, না বুঝে সরে এলাম।

প্রভু! যেন আমি আর জেরোম পাশাপাশি তোমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি, পরস্পরকে যেন সাহায্য করতে পারি। তীর্থ-যাত্রীর মতো যেন আমরা সংসারের পথে চলতে পারি। তীর্থযাত্রীরা যেমন করে বলে, তেমনি করেই যেন আমারা পরস্পরকে বলতে পারি, যদি ক্লান্তি আসে ভাই, আমার দেহের উপর এলিয়ে পোড়ো। এই উত্তর যেন দিতে পারি, তুমি কাছে আছ, এই অনুভূতিই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট···

কিন্তু তা তো নয় প্রভু! তুমি যে পথের হদিশ দিয়েছ, সে তো সংকীর্ণ পথ—এত সংকীর্ণ যে সেখানে তো দুজনে পাশাপাশি চলা যায় না।

আঁদ্রে জিদ্

৫ই জুলাই

এই সপ্তাহ চলে গেল, এই ডায়েরী বইখানা আর খোলাই হয় নি। গত মাসে যখন বইখানার কয়েক পাতা আবার পড়ছিলাম, তখন হঠাৎ অদ্ভুত ইচ্ছা পেয়ে বসলো, ভাল করে ওর কথা লিখবো। এতো নির্বুদ্ধিতা, দুষ্টবুদ্ধি।

নিজের উপকারের জন্য নামটা লিখছি, সেখানে এল ওর কথা। ওকে উদ্দেশ্য করেই লিখে চললাম।

নিজের ·যেগুলি সুলিখিত মনে হয়েছিল, সেই পাতাগুলি আজ ছিঁড়ে ফেলেছি। ওর কথা যেখানে যেখানে আছে সেগুলিও ছিঁড়ে ফেলা উচিত। কিন্তু পারলাম না তো।

এই কখানা পাতা ছিঁড়ে ফেলেই মনে একটু গর্ব হলো।···আমার মন যদি অমন রুগ্ন না হোত, তা হলে ঐ গর্ব তো আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম। সত্যি মনে হয়েছিল, একটা কাজের কাজ করেছি। যেন বহুমূল্য সম্পদ ধ্বংস করলাম।

৬ই জুলাই

বইয়ের তাক থেকে নিজেকে নির্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছি··

ওর স্মৃতি ভুলতে গিয়ে একখানা বই রেখে আর একখানা তুলে নিই। সেখানেও শুনি ওর স্বর। যে-পাতাগুলি ও পড়ে শোনায়নি, সেখানেও ওর স্বরই শোনা যায়। ওর যাতে আনন্দ, তাই আমার কাছে প্রিয়, ওর মনের ছাঁচে এমন করে ঢালাই হয়েছে আমার মন যে, আমি এক থেকে অপরকে আলাদা করে দেখতে পারি না।

আগে যেমন আমাদের অভিন্ন মনের কথা ভেবে খুশি হতাম, ঠিক তেমনিই তো রয়ে গেছে মনের অবস্থা।

কখনো কখনো খারাপ করে লিখি—যাতে ওর কথার ছন্দ এড়িয়ে চলতে পারি, কিন্তু এই যে ওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এও তো

ওরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক-স্থাপন। শেষে ঠিক করেছি বাইবেল ছাড়া আর কিছু পড়বনা (হয়তো ইমিটেশন অফ্ ক্রাইসট ও পড়তে পারি) আর এই বইয়ের পাতায়ও তেমন কিছু লিখব না—শুধু আমি কি পড়লাম, তার কথাই থাকবে।

এর পরের রোজনামচায় প্রতিদিনের তারিখের সঙ্গে আছে বাইবেলের উদ্ধৃতি। এমনি করে ১লা জুলাই অবধি গিয়ে পৌচেছে। যেখানে উদ্ধৃতির সঙ্গে ভাষ্য আছে। সেইগুলিই তুলে দিলাম।

২০শে জুলাই

তোমার যা কিছু আছে বিক্রি করে গরীবকে দান কর।

বুঝেছি—আমার এই আত্মা—শুধু জেরোম একাই যার মালিক—তাকে বিলিয়ে দিতে হবে গরীবের জন্য। এই ভাবে আমিও কি ওকে দানের মর্মকথা শেখাতে পারব না?...প্রভু, আমাকে শক্তি দাও!

২৪শে জুলাই

'অন্তঃমানসের সান্ত্বনা' আর এখন পড়ছি না। সাবেকি আমলের ভাষা আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু আমাকে অন্য পথে সে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। সেতো আমাকে আদিম মানুষের আনন্দ দিলে—কিন্তু আমার সে আত্মার উৎকর্ষ কোথায়?

আবার 'খৃষ্টের অনুসরণে' পড়ছি। লতিন ভাষায় নয়, লাতিন পড়তে পারি বলে পাছে অহংকার হয় তাই মূল বইখানা পড়ছি না। যে অনুবাদখানা পড়ছি, সে খানায় অনুবাদকের নাম নেই। প্রথম পাতায় লেখা সমগ্র খৃষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য।

নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত করে কতখানি শান্তি তুমি নিজে পাবে, কতটুকু আনন্দ তুমি অপরকে বিলাতে পারবে—যদি তোমার সে চেতনা থেকে থাকে, তাহলে তো তুমি আত্মিক উন্নতির পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেলে।

১০ই আগষ্ট

হে আমার ঈশ্বর, যদি শিশুর আবেগে তোমার কাছে চীৎকার করে উঠতে পারতাম—যদি দেবদূতের অমৃতময় রসনা আমার থাকতো···

আমি তো জেরোমের কাছে থেকে কিছু নিইনি সবই তো তোমার দান প্রভু।

তবে কেন তোমার আর আমার মাঝখানে ওর মূর্তি এনে সর্বত্র বসিয়ে দিলে?

১৫ই আগষ্ট

আর ছমাস আছে আমার কাজ শেষ করবার....প্রভু, আমার সহায় হও!

২০শে আগষ্ট

আমার মনের অশান্তি আমাকে জানিয়ে দেয়—আমি অনুভব করি—ও আহূতিদানে তো সিদ্ধি লাভ হয় নি। হে আমার ঈশ্বর এখন থেকে এইটুকু শুধু কর—ও আমাকে যে আনন্দ দান করতো—সেই আনন্দ যেন তোমার কাছ থেকেই শুধু পাই। একমাত্র তোমারই ঋণেই যেন ঋণী হই।

২৮শে আগষ্ট

আমার বিশ্বাস কত সাধারণ, কত হীন। তাহলে কি আমি নিজের অনেকখানিই ফুরিয়ে ফেলেছি—হারিয়ে ফেলেছি···আর বুঝি সইবারও শক্তি নাই।

ভগবানকে শুধু শুধু ডেকে কেন শক্তি চাই—এ আমার কি ভীরুতা! আমার প্রার্থনা তো এখন অভিযোগেরই নামান্তর।

২৯শে আগষ্ট

প্রান্তরের লিলি ফুলের কথা ভেবে দেখ...

এই সরল সহজ বাণী আমার মন আজ সকালে বিষণ্ণতায় ভরে

দিলে, আমার তো তার থেকে অব্যাহতি নেই। আমি বেড়াতে বেরুলাম গ্রামে। এই কথা, বার বার আপন মনে আউড়িয়ে গেলাম। আমার বুক ভরে গেল, চোখ ভরে গেল জলে। বিস্তৃত রিক্ত প্রান্তর চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো, যেখানে মজুররা করছে লাঙ্গলের উপর ঝুঁকে পড়ে মেহনতি।···প্রান্তরের লিলি···কিন্তু প্রভু, কোথায়—কোথায় সেই ফুল?

১৬ই সেপ্টেম্বর, রাত দশটা

আবার দেখা হোল। এই বাড়িতেই ও এসেছে, আছে। ওর জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ছে ঘাসে। আমি দেখতে পাচ্ছি। ও জেগে আছে, আমি লিখছি ওর কথা। হয় তো আমার কথাই ও ভাবছে। পরিবর্তন ওর হয়নি। ও তাই বলে, আমি ও বুঝি। ওর কাছে কি আমার সংকল্পটি টি ঁকবে ওর ভালবাসা থেকে ও কি আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে?

২৪শে সেপ্টেম্বর

উঃ কি যন্ত্রণা এ আলাপে—আমি তো উদাসীনতার ভান করে আছি—এদিকে আমার বুকখানা তো মূর্চ্ছাহত। এখন অবধি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছি ওকে। আজ সকালে, আমার বিশ্বাস জন্মেছে, ভগবান আমাকে জয়ী হবার মতো শক্তি দেবেন, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আমি যাব না—হব না ভীরু। আমি কি জয়ী হয়েছি? জেরোম কি আমাকে একটু কম ভালবেসেছে? হায়—আশা আর ভয় এক সঙ্গেই যে এল! এমন করে ওকে আর বুঝি কখনো ভালবাসিনি।

প্রভু, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, ওকে যদি আমার কাছ থেকে রক্ষা করতে চাও—তাহলে হলে তাই হোক! আমার নিজের নরকে আমি ডুবে থাকি।

আমার হৃদয়ে এস প্রভু, আমার আত্মায়—আমার দুঃখ সইবার শক্তি দাও—তোমার কামনার দাহন সইবার শক্তি দাও!

আঁদ্রে জিদ্

পাস্কালের কথা বলছিলাম আমরা...আমি কি বললাম? কি লজ্জার কথা—কি নির্বোধের মতো কথা! যখন বলছিলাম, তখনি কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আজ রাতে তো মহা নিন্দা বলে মনে হোল। 'পেনসী'র ঐ ভারী খণ্ডখানা উলটে-পালটে গেলাম। হঠাৎ খুলে গেল সেই পাতাখানা, যেখানে কুমারী হু রোনেজকে লেখা চিঠিখানা আছে :

যিনি আমাদের নেতা তাঁকে যদি স্বেচ্ছায় অনুসরণ করি তাহলে তো আমাদের এই বন্ধন অনুভব করব না। কিন্তু যেই আমাদের বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় আমরা ছিঁড়ে পালিয়ে আসতে চাই—তখনি তো দুঃখ পেতে হয়।'

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কথাগুলি অভিভূত করে ফেললো। আর পড়বার মতো শক্তি রইল না। কিন্তু বইয়ের আর একটা জায়গা উল্‌টে এক চমৎকার পংক্তি আবিষ্কার করলাম। আমি তো জানতাম না, তাই টুকে রেখেছি।

রোজনামচার প্রথমখণ্ড এইখানেই শেষ। এবিষয়ে নিশ্চিন্ত যে পরবর্তী খণ্ড ছিঁড়ে ফেলা হয়। কেননা নামচা তিন বছরের পূর্ব্বে আর শুরু হয় নি—তখনো সে কোঁগেসমিরে। সেপ্টেম্বর মাস তখন, আমাদের শেষ সাক্ষাতের কিছুদিন আগে।

শেষ খণ্ড এইভাবে শুরু হয় :

১৭ই সেপ্টেম্বর

ভগবান, তোমাকে ভালবাসার জন্যেই তো ওকে প্রয়োজন—এ কথা তো তুমি জান।

২০শে সেপ্টেম্বর

হে ভগবান, ওকে আমাকে দাও, আমি আবার আমাকে সমর্পণ করবো তোমার কাছে।

হে ভগবান, আর একবার ওর যেন দেখা পাই।

আঁদ্রে জিদ্

হে ভগবান, আমি নিজের মন তোমাকে সঁপে দিতে প্রবৃত্ত। আমার ভালবাসা যা চায় তাই দাও! আমি তো জীবনের যা কিছু আছে তোমাকে দেব।

হে ভগবান, আমার এই হীন প্রার্থনা ক্ষমা কর, কিন্তু আমার ঠোঁট থেকে তো ওর নাম দূর করে দিতে পারি না—হৃদয়ের ব্যথাও তো ভুলতে পারি না।

হে ভগবান, তোমার কাছে তাই তো আমার ক্রন্দন। আমার দুঃখে আমাকে ছেড়ে যেও না!

২১শে সেপ্টেম্বর

আমার নামে তোমার পরম পিতাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করবে··· প্রভু, তোমার নামে তো পারি না—আমার সাহস নেই!

যদিও এখন আমি প্রার্থনায় অক্ষম—তুমি কি আমার মনের এই প্রলাপময় কামনার খবর রাখ না?

২৭শে সেপ্টেম্বর

সকাল থেকেই মনে মহা শান্তি, সমস্ত রাত কেটেছে প্রার্থনায়, চিন্তায়। হঠাৎ যেন অনুভব করলাম উজ্জ্বল শান্তি—যেমন ছেলে-বেলায় সেই দিব্য আবির্ভাবে পেয়েছিলাম—ঠিক তেমনি। আমাকে যেন আবৃত করে ফেললো, আমার মনে যেন এসে নামলো তার আবির্ভাব। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভয় পাছে আমার এই আনন্দ স্নায়ুর উচ্ছলতা হয়ে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম—কিন্তু আনন্দ উবে গেল না। এখনো এই সকালেও সে তার পূর্ণতা নিয়ে ফুটে আছে। আমি নিশ্চিত জানি, ও আসবে।

৩০শে সেপ্টেম্বর

জেরোম, আমার বন্ধু! তোমাকে এখনো ভাই বলে ডাকি—কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়েও এ যে অসীম···বার্চগাছের কাছে গিয়ে

কতবার তোমার নাম ধরে ডেকেছি! রোজ সন্ধ্যায় খিড়কির বাগানের ছোট ফটকটা খুলে বেরিয়ে যাই। ঘুরে বেড়াই গাছপালার পাড় দেওয়া পথে। সেখানে তখন অন্ধকার ঘোর হয়ে আসে। হঠাৎ যদি তুমি আমার ডাকে উত্তর দিয়ে ওঠ, ঐ যে পাথরের বেদী যার চারদিকে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াই—ওরই আড়াল থেকে যদি তুমি বেরিয়ে আস—বা যদি তোমাকে দূর থেকে দেখি—বেঞ্চে আমারই প্রতীক্ষায় রয়েছ—আমার হৃদয় তো নেচে উঠবে না অতর্কিতে···না! তোমাকে দেখে আমি অবাক হব না।

১লা অক্টোবর

এখনো কিছু নয়। সূর্য এখন অতুলন আকাশের নির্মলতায় ডুবে গেল। আমি প্রতীক্ষায়। জানি, শীঘ্রই আমি এই বেঞ্চে ওর পাশে এসে বসবো। ওর স্বর তো শুনতে পাচ্ছি। ও যখন আমার নাম ধরে ডাকে তখন এত ভাল লাগে ওর স্বর! ও আসবে এখানে! আমি ওর হাতে হাত রাখবো। আমার মাথা এলিয়ে দেব ওর কাঁধে। ওর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পড়বে আমার নিশ্বাস। কাল ওর কতগুলো চিঠি বার করলাম আবার পড়বো বলে। নিয়েও এলাম—কিন্তু পড়া আর হয়নি। ওর চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম। আমার সঙ্গে সেই পদকখানিও নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর তো সেখানা ভারী পছন্দ। গ্রীষ্মে প্রতি সন্ধ্যায় তো সেখানা পরতাম গলায়। ওকে যত দিন যেতে না দিতে চাই তারই অভিজ্ঞান ছিল ওখানি। ওকে পদকখানা দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বহুদিন পরে আবার স্বপ্ন দেখলাম—ও বিয়ে করেছে—আমি ওর মেয়ে খুদে আলিসার ধর্ম-মা হয়েছি—তাকে দিয়েছি পদকখানা···কেন ওকে বলতে সাহস করিনি সে কথা?

২রা অক্টোবর

আমার আত্মা আজ যেন লঘুপক্ষ পাখীর মতোই আনন্দময়।

আজ ও আসবে। আমি অনুভব করছি। জানি। আমি জানিয়ে দিতে চাই জগতকে। মনে যে তাগিদ পাচ্ছি, এখানে লিখতে হবে। আমার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছি না। এমন কি রোবার্ত, এমনি আমার সম্বন্ধে অমনোযোগী, উদাসীন—সে-ও লক্ষ্য করেছে। ওর প্রশ্নে আমি বিব্রত। কি উত্তর দেব ভেবে পাই নি। আজ সন্ধ্যে অবধি কি করে প্রতীক্ষা করে থাকবো ?

আমার চোখের উপরে যেন স্বচ্ছ এই পট্টি বাঁধা হয়েছে। অদ্ভুত পট্টি—ওর ছবিই সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি—ওর ছবি যেন বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। ভালবাসার যত রশ্মি আমার হৃদয়ের প্রোজ্জ্বল স্থানে যেন পুঞ্জীভূত।

উঃ একি ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা !

হে প্রভু, এক মুহূর্তের জন্য আমার কাছে খুলে দাও আনন্দের প্রশস্ত দ্বার।

৩রা অক্টোবর

সব শেষ ! হায়, ও আমার আলিঙ্গন থেকে ছায়ার মতো সরে গেল ! ও এসেছিল ! এসেছিল ! এখনো ওর সত্তা আমি অনুভব করি। ওকে ডাকি। আমার বাহু, আমার অধর এখনো রাতে ওকে বৃথা খুঁজে খুঁজে বেড়ায়···

ঘুমোতে পারি না, প্রার্থনা করতে পারি না। আবার গেলাম ঐ আঁধারঘেরা বাগানে। ঘরে থাকতে ভয়—বাড়িতে থাকতে ভয়। আবার সেই দরজার পরপারে আমার ব্যথা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল—ওখানেই তো ওকে ফেলে এসেছিলাম। দরজা খুললাম এক অধীর উন্মত্ত আশায়, যদি ও ফিরে আসে। ডাকলাম। অন্ধকারে হাতরে হাতরে বেড়ালাম। আবার ফিরে এসে ওকে চিঠি লিখতে বসেছি। দুঃখকে মেনে নিতে তো পারছি না।

কি হোলো ? কি বলেছিলাম ওর কাছে ? আমার হৃদয়

যা অস্বীকার করে সে-ধর্মের মূল্য কি? ভগবান আমার মুখে যে শব্দ দিয়েছিলেন, আমি তো গোপনে তারই বিরুদ্ধতা করেছি। আমার বুক ফেটে গেল, তবু তো লেখা বার হোল না। জেরোম জেরোম, আমার দুঃখী বন্ধু—তোমার কাছে থাকলে তো আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরে, আবার তুমি চলে গেলে তো আমি মরি। এইমাত্র যা তোমাকে বললাম, বিশ্বাস করোনা। শুধু বিশ্বাস করো আমারই ভালবাসার কথা।

চিঠি ছিঁড়ে ফেললাম। আবার লিখলাম···উষা, ধূসর; অশ্রু-ভেজা—আমারই ভাবনার মতো বিষাদিতা। খামার বাড়ির প্রথম সাড়া পেলাম, যা কিছু ছিল ঘুমন্ত—জেগে উঠলো। ওঠ-জাগো এবার। লগ্ন তো এল···

আমার চিঠি যাবে না ওর কাছে। যেতে পারবে না।

৫ই অক্টোবর

হে ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর, আমাকে তুমি একি বাড়িয়ে তুলেছ। আমার হৃদয় অধিকার কর। এখন থেকে তো আর আবেগ থাকবে না, আর কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না। আমার এই বিষাদময় ধ্বংসাবশেষ থেকে আমাকে জয়ী হতে সাহায্য কর। এই বাড়ি, এই বাগান আমার ভালবাসায় এক দুঃসহ প্রেরণা জোগাচ্ছে। আমি অন্য কোথাও চলে যাব—সেখানে তোমাকে ছাড়া আর কারো দেখা আমি পাবনা।

আমার যা কিছু আছে তোমাকে সঁপে দিতে তুমিই আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে ফোঁগেসমির ছেড়ে চলে যেতে দাও! আমি তো রোবার্তকে সহজে বিষয় আশয় দিতে পারছি না। আমার উইল করেছি সত্য, কিন্তু উইলের প্রয়োজনীয় সর্তগুলি কি জানি না। কাল য়্যাটর্ণির সঙ্গেও ভাল করে কথা বলা হোল না—ভয় হোল,

পাছে উনি আমার সংকল্প টের পেয়ে জুলিয়েৎ আর রোবার্তকে জানান। আমি পারীতে গিয়ে এগুলির ব্যবস্থা করবো।

১০ই অক্টোবর

এমন ক্লান্ত হয়েই এসে পৌঁছলাম যে দুদিন তো বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য হলাম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাক্তার ডেকে আনা হোল, তিনি অস্ত্রপ্রচারের কথা বললেন। সেটা নাকি এক্ষেত্রে দরকার। আপত্তি করে কি লাভ? কিন্তু ওঁকে সহজেই বুঝিয়ে দিলাম, আমি অস্ত্রপ্রচারের কথাতেই ভয় পাই, আর যে পর্যন্ত না খানিটা বল পাই ততদিন অপেক্ষা করতে চাই।

নিজের নাম-ধাম লুকিয়ে রেখেছি। এখানকার যারা পরিচালক তাঁদের হাতে অনেক টাকা দিয়ে রেখেছি! আমাকে ভর্তি করে নেওয়া বা ভগবান যতদিন রাখেন ততদিন রাখায় কোনো অসুবিধেই হবে না।

এই ঘরখানি আমার পছন্দ। দেয়ালে অন্য কোন কারুকার্য নেই। বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্নতায় সমুজ্জ্বল। ভেবে অবাক লাগে, মন যেন খুশি। কারণটা এই—আর জীবন থেকে কিছুই আশা করি না—এখন ভগবানকে নিয়েই আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তাঁর ভালবাসা তো তখনি মধুর যখন, তা আমাদের মনের সবখানি ফাঁকা ভরিয়ে দেয়…

বাইবেলখানাই শুধু এনেছি। কিন্তু আজ যেন শব্দের চেয়েও বড় কিছু আমার মনে ধ্বনিত হচ্ছে। আমি সেখানে পেয়েছি পাস্কালের ঐ উন্মত্ত আবেগময় ক্রন্দন!

যা ঈশ্বরের নয়, তাতে তো আমার কামনা মিটবে না। হায়, আমার অপরিণামদর্শী হৃদয় বড় বেশি পার্থিব আনন্দ চেয়েছিল! আমার হৃদয় থেকে এই ক্রন্দন নিষ্কাশিত করে নেবার জন্যে আমাকে এমনি করে বঞ্চিত করলে প্রভু?

আঁদ্রে জিদ

১২ই অক্টোবর

তোমার রাজ্য আবির্ভূত হোল। আমার মনে নামুক সেই আবির্ভাব যাতে তুমি একা আবার রাজ্যেশ্বর হতে পার—একা তুমি! আর তোমাকে হৃদয় সমর্পণ করতে আমি তো একটুও দ্বিধা করবো না।

আমি এমন ক্লান্ত, মনে হয় যেন বড় বুড়ো হয়ে পড়েছি—কিন্তু আমার আত্মা তো এক অদ্ভুত ছেলেমানুষি বজায় রেখেছে। এখনো আমি সেই ছোট্ট মেয়ে। সে যেন ঘরের সব কিছু পরিষ্কার না করে নিজের ছাড়া পোষাকটি নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে বিছানার পাশে না রেখে শুতে যেতে পারে না।…আমি এমনি ভাবেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই।

১৩ই অক্টোবর

নষ্ট করে ফেলার আগে নিজের রোজনামচা পড়লাম! যাঁরা সৎস্বভাবের তাঁরা কখনো তাঁদের চারদিকে মনের অশান্তিকে ছড়িয়ে দেননা—এ তাঁদের উপযুক্ত কাজ নয়। মনে হয় একজন ভাবুক এ কথা চমৎকার করেই বলেছিলেন।

আমি এই রোজনামচা যখন আগুনে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেমন যেন এক হুঁশিয়ারী অনুভব করলাম; নিরস্ত হলাম। মনে হোল, এতো আমার নয়। আমি জেরোমকে এর অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারি না। ওর জন্যে ছাড়া তো কখনো লিখিনি। আমার সেই উদ্বেগ আর সন্দেহকে এখন তো এমন বোকামি বলেই মনে হয় যে, আর তার বড় মুল্য দিই না। জেরোমকে সেগুলি বিব্রত করবে এমন কথাও ভাবি না। হে আমার ঈশ্বর, শুধু এইটুকু প্রার্থনা পূর্ণ কর যেন সে মাঝে মাঝে এই রোজনামচার ছত্রে একখানি হৃদয়ের অপটু উচ্চারণধ্বনি শুনতে পায়। আমি যেখানে উঠতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলাম, তাকে ধর্মের সেই উত্তুঙ্গে তোলার প্রেরণার যেন সে সন্ধান পায়।

আঁদ্রে জিদ্

হে আমার ঈশ্বর, আমাকে সেই শিলাখণ্ডের কাছে নিয়ে চল— আমার থেকে তো সে শিলা উচ্চতর।

১৫ই অক্টোবর

আনন্দ···আনন্দ···আনন্দ···আনন্দের অশ্রু ঝরছে!

মানুষের সুখের উর্ধে, সমস্ত দুঃখের পরপারে—সেই দীপ্ত আনন্দকে আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমার চেয়েও উচ্চ সে শিলা, আর তারই নাম সুখ···আমি বুঝেছি—আমার সমস্ত জীবন বৃথা কেটেছে— হে আমার প্রভু. পবিত্র, উৎসর্গীত আত্মার কাছে তোমার এই তো অঙ্গীকার—তোমার পবিত্র বাণী তো বলে—এখন থেকে আশীষ বর্ষিত হোক, যাঁরা প্রভুর ভিতরে মিশে যায় তাঁরাই তো আশীর্বাদ-ভাজন। আমি কি মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করবো? এইখানে আমার বিশ্বাসের ভিত্ কেঁপে ওঠে। প্রভু! তোমার কাছে আমার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে কেঁদে উঠি। আমি তো অন্ধ তমসায় নিমজ্জিত, উষার প্রতীক্ষায় আছি। তোমার উদ্দেশ্যে এই যে আমার ক্রন্দন এতো আমাকে মৃত্যুলীন করে দিলে। এস—আমার হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটাও। আমি তো সুখের তৃষ্ণায় তৎপর···না নিজেকে এই বলে বোঝাব যে, আমি সে-সুখ পেয়েছি। অসহিষ্ণু পাখীর গান যেমন উষার আগে আলোর সূচনা করে না, আবাহন করে, তেমনি করে কি আমি গান গাইব? রাত পোহাক, সে প্রতীক্ষায় কি বসে থাকব না?

১৬ই অক্টোবর

জেরোম, আহা, তোমাকে যদি দিব্য আনন্দ দিতে পারতাম।

আজ ভোরে রোগের প্রকোপে আমি যেন চুরমার হয়ে গেলাম। তারপরে এমন দুর্বল লাগলো যে, মুহূর্তের জন্য মনে হোল, আমি মরতে বসেছি। না। প্রথমে আমার উপরে নেমে এল এক মহা শান্তি; তারপরে ব্যথায় আমাকে বিদ্ধ করলে—আমার রক্ত মাংস

আর আত্মা কেঁপে কেঁপে উঠলো—এ যেন আকস্মিক আর মোহহীন দিব্যজ্যোতি। মনে হোল, এই প্রথম দেখলাম—আমার ঘরে দেয়াল যেন উদ্ধত শূন্যতায় ভরে আছে। ভয় পেলাম। এখন পর্যন্ত নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্য লিখে যাচ্ছি, শান্ত করবার জন্য লিখছি। প্রভু, আমি কি তোমার নিন্দে না করে আমার অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছতে পারবো !

আবার উঠতে পারছি। ছেলেমানুষের মতো হাঁটু গেড়ে বসতে চাই···

মরতে চাই, তাড়াতাড়ি মরতে চাই। আমি একা এ উপলব্ধি আবার আসার আগেই চাই।

গত বছর আবার জুলিয়েতের সঙ্গে দেখা। আলিসার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করে লেখা ওর শেষ চিঠির পরে দশ বছর চলে গেছে। প্রোভেন্সে গিয়েছিলাম নিমেসে নামবার সুযোগ পাওয়া গেল। আভিন্যু দ্য ফুচেরে তিসিয়েরদের বাড়িখানার নাম-ডাক আছে। শহরের কর্মব্যস্ততার কেন্দ্রস্থলে, বাড়িখানি আমি নিজের পৌঁছবার খবর দিয়েই রেখেছিলাম। কিন্তু তবু যথেষ্ট আবেগ নিয়েই আঙিনা পার হলাম।

একজন পরিচারিকা আমাকে বসবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে এল জুলিয়েৎ। আমার মনে হোল, প্লতিয়েঁ মাসিকে দেখছি—তেমনি চলার ভঙ্গী, তেমনি মেদ আর তেমনি নিশ্বাসরোধী আতিথেয়তা। ও আমাকে তখুনি জেরা শুরু করে দিলে (আমার প্রশ্নের অপেক্ষা রাখলে না)—আমার পেশা, পারীর জীবনধারা, আমার উন্নতি, পরিচিতজন সবই বলে গেল। এমন কি দক্ষিণ অঞ্চলে কেন আগমন সেকথা পর্যন্ত। আগে তিভিতো যাব না কেন, এদুয়ার আমাকে পেয়ে খুশি হবেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।···তারপরে সমগ্র পরিবারের খবর, স্বামীর কথা,

ছেলেমেয়েদের কথা, ভাইয়েদের কথা। তারপরে গত আঙুরের খন্দের খবর, হেমন্তকালের দামের হিসেব সুদ্ধু।...খবর পেলাম রোবার্ত ফোঁগেসমির বিক্রি করে দিয়েছে আগে-ভিভেতে বসবাসের জন্য। এখন সে এতুয়ারের অংশীদার। তাই স্বামী এখন স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন, বিশেষ করে ব্যবসাসংক্রান্ত দিকটা দেখাশুনা করেন। রোবার্ত চাষের ব্যাপার দেখে—আঙুর বাগিচার উন্নতি এবং বিস্তারের কথাই ভাবে।

এরই মধ্যে আমি অস্থির হয়ে এমন কিছু খুঁজছিলাম যাতে অতীতকে জাগিয়ে তোলা যায়। বসবার ঘরের নতুন আসবাব পত্রের ভিতরে ফোঁগেসমিরের কয়েকখানা জিনিস দেখে চিনলাম। কিন্তু যে অতীত আমার মনে স্পন্দন তুলেছে, জুলিয়েৎ তো সে সম্বন্ধে একেবারে অচেতন। নয়তো আমাদের ভাবনা সে দিক থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

সিঁড়িতে দুটি বারো আর তেরো বছরের ছেলে খেলা করছিল, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সে তাদের ডাকলো। ওদের বড় মেয়ে লিসে বাবার সঙ্গে আগে-ভিভেয় চলে গেছে। আর একটি দশবছরের ছেলে এখুনি বেড়িয়ে ফিরবে। শোকসংবাদ যে চিঠিখানাতে ছিল, তাতেই এর আগমন আসন্ন একথা জানিয়েছিল জুলিয়েৎ। এই শেষবারের প্রসব নিয়ে কিছুটা হাঙ্গামাই হয়। বহুদিন এর ধকল তাকে পোহাতে হয়েছে। তারপরে গত বছর একটি মেয়ে প্রসব করেছে। এ যেন শেষে হয়ে গেল ঘটনা তারই ভাবনার সামিল। ওর কথা শুনে মনে হয়, সব ছেলেমেয়ের চেয়ে এটিকেই ওর পছন্দ বেশি।

ও বললে, ও আমার ঘরে ও ঘুমিয়ে আছে। এই পাশেই ঘর। এসে দেখ!

পিছনে পিছনে চললাম। ও আবার বললে, জেরোম, তোমাকে লিখতে সাহস হয় নি। তুমি ওর ধর্ম-বাপ হবে?

সানন্দে, অবশ্য যদি তোমার ইচ্ছে থাকে, আমি একটু অবাক হয়ে বললাম। দোলনার উপর তখন ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম। আমার ধর্ম-কন্যার নামটি কি শুনি ?

আলিসা…ও ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো। ও অবিকল ওর মতো দেখতে হয়েছে ! তোমার মনে হয় না ?

উত্তর না দিয়েই জুলিয়েতের হাতখানায় একটু চাপ দিলাম। ওর মা তুলে নিতেই খুদে আলিসা চোখ মেললো ; ওকে আমি কোলে তুলে নিলাম।

জুলিয়েৎ হাসতে চেষ্টা করে বললে, উঃ কি চমৎকার ধর্ম-বাপ হবে তুমি ! তারপর বিয়ে করছ না যে ?

উত্তর দিলাম, আরো তো অনেক জিনিস ভুলে গেছি। দেখলাম ওর গালে রক্তরাগ।

কোনটা তাড়াতাড়ি ভুলতে চাও ?

যা কখনো ভুলতে চাই না।

ও হঠাৎ বলে উঠলো, এদিকে এস। একটা ছোট্ট কামরায় নিয়ে গেল। তখন সে ঘর অন্ধকার। একটা দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে ওর ঘরে যাওয়া যায় ; আর একটা দরজা দিয়ে বসবার ঘরে।

ও বললে, আমার যখন বিশ্রাম মেলে তখন এখানে এসে আশ্রয় নিই। বাড়ির ভিতরে এইটিই সবচেয়ে নিরিবিলি ঘর। এখানে এলে মনে হয় যেন সংসার থেকে অব্যাহতি পেলাম।

অন্য দুটি ঘরের মতো এই ছোট ঘরটির জানালাও শহরের গোলমাল যেদিকে সেদিকে নয়, জানালা মুখিয়ে আছে আঙ্গিনার দিকে। সেখানে গাছপালা।

ও একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, এস আমরা বসি তোমাকে যদি সত্যিই বুঝে থাকি, তাহলে মনে হয় ওর স্মৃতির কাছে তুমি একনিষ্ঠ থাকতে চাও।

তখনি উত্তর দিলাম না। তারপর বললাম, বরং আমার সম্বন্ধে ওর যে ধারণা ছিল তারই কাছে একনিষ্ঠ থাকতে চাই। না, না. আমাকে এর জন্যে তারিফ করো না। অন্য কিছু করা তো সম্ভব নয়। যদি অন্য কাউকে বিয়ে করতাম, তার কাছে তো ভালবাসার ভান করতাম মাত্র।

ও! উদাসীনভাবেই ও বললে, তারপরে আমার কাছ থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে নীচু হয়ে কি দেখতে লাগলো। মনে হোল কিছু বুঝি হারিয়েছে। তাই খুঁজছে। তারপরে বললে, তোমার তা হলে মনে হয়, মানুষ নিষ্ফল ভালবাসা বুকে এতদিন জিইয়ে রাখতে পারে?

হাঁ পারে জুলিয়েৎ।

জীবন তার উপর দিয়ে প্রত্যহ বয়ে যায়, অথচ তাকে নিবিয়ে দিতে পারে না?

ধুসর তরঙ্গের মতো সন্ধ্যা এল ধীরে ধীরে। কাছে এল, ভাসিয়ে দিলে। অন্ধকারে সব কিছু যেন আবার জীবন পেয়ে জেগে উঠলো। অতীতের কাহিনী বলে গেল ফিসফিস করে। আবার আলিসার সেই ঘরখানা দেখতে পেলাম, তার সমস্ত আসবাব পত্রই জুলিয়েৎ এখানে এনে রেখেছে। এবার সে আবার আমার দিকে ফিরে তাকাল। এমন অন্ধকার যে দেখা যায় না ওকে, তাই বুঝলাম না—ওর চোখ বোজা কিনা। ওকে দেখে ভারী সুন্দর মনে হোল। আমরা দুজনেই নীরব হয়ে রইলাম।

ও অবশেষে বললে, এস, আমাদের জাগতে তো হবেই।

দেখলাম ও উঠে পড়েছে। এক পা এগিয়ে গেছে। আবার বসে পড়লো। মনে হোল, ও কাঁদছে। যেন তাই দেখলাম।

একজন ভৃত্য এবার আলো নিয়ে এসে ঢুকলো ঘরে।

সমাপ্ত

আঁদ্রে জিদ